

নভোখেয়া

প্রথম সংখ্যা

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী 'নভোখেয়া' শাবিপ্রবির সংগঠন কোপার্নিকাস
অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল মেমোরিয়াল অব সাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত। এর প্রচ্ছদে থাকা ওরিয়ন
নেবুলার (M42) ছবিটি আখালিয়া, সিলেট থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ 'দূরবিন'-এর ইকুইনক্স
টেলিস্কোপ ব্যবহার করে তুলেছেন কাজী তাসমিয়া বিনতে ইমাম তিশা।



কিছু কথা

সম্পাদনা

আহমাদ আল-ইমতিয়াজ
নাফিসা নুজহাত
আদনান শাহরিয়ার
সৌরভ মনি বিশ্বাস
জান্নাতুল মোকাররমা
মো: হাসিবুল কবির শিমুল

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিজ্ঞানের সবচেয়ে প্রাচীনতম শাখা। এটি শুধু আকাশের নক্ষত্র ও গ্রহের গতিপথ নির্ধারণ করে না বরং রহস্যকে উন্মোচন করার চেষ্টাও করে। আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় জ্যোতির্বিজ্ঞান পৃথিবী থেকে বহু বহু আলোকবর্ষ দূরের মহাজাগতিক ঘটনাগুলোর উপর নজর রাখতে সক্ষম হয়েছে। যদিও আমাদের দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা, প্রচার ও প্রসার এবং দিকনির্দেশনার বিরাট ঘাটতি রয়েছে। বহু শিক্ষার্থীর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানে ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে পারে না।

প্রচ্ছদ

কাজী তাসমিয়া বিনতে ইমাম তিশা
কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয় সংগঠন ‘কোপার্নিকাস অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল মেমোরিয়াল অব সাস্ট’ জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই ঘাটতি পূরণ করার জন্যই নানা কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রকাশ পাচ্ছে ক্যাম-সাস্টের বহুল প্রত্যাশিত এবং প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী ‘নভোখেয়া’।

ডিজাইন

কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

সাময়িকীর জন্য আগত লেখাগুলোর সম্পাদনা করার সময় ‘ডাবল ব্লাইন্ড রিভিও’ মেথড ব্যবহার করা হয়েছে। এতে লেখা প্রকাশের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও সাময়িকীতে ব্যবহৃত ছবিগুলোর যথাযথ স্বত্ব প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু চিত্র ও গ্রাফ আমাদের নিজেদের তৈরি করা। লেখার শেষে যথাযথ তথ্যসূত্র প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। এর বাইরেও আমরা ভুল ত্রুটির উদ্বেগ নই। আমাদের লেখায় কোনো প্রকারের ভুল লক্ষ্য করতে পারলে আমাদেরকে ইমেইলের মাধ্যমে জানান, আমরা তা সমাধানে কাজ করব।

বানান অংশাধিন

মীম আক্তার মায়ী
প্রত্যাশা তালুকদার
মেহেরাজুল হাসান
কাজী নুসরাত তাসনিম
রওনক শাহরিয়ার

এই ম্যাগাজিনটির কাজ শুরু হয় নবম কার্যনির্বাহী কমিটিতে। এরপর দীর্ঘকাল ধরে নানা জটিলতায় এর কাজ ব্যহত হয়। বর্তমানে দ্বাদশ কার্যনির্বাহী কমিটি চলমান। পূর্বের কমিটিগুলোর সকল প্রকাশনা সম্পাদক এবং যারা সাময়িকীটি প্রকাশিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন কাজে অবদান রেখেছেন সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন। এছাড়া বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই সকল লেখকদের, দীর্ঘ সময় আপনারা ধৈর্য্য এবং আশার সাথে অপেক্ষা করেছেন।

পরামর্শকবৃন্দ

মোঃ সাইফুল ইসলাম
শাহরিয়ার কবির
সুমিত রায় প্রণয়
আহমাদ আল-ইমতিয়াজ
নাফিসা নুজহাত
তামসি আলি
স্বাগত তীর্থ

কাজী তাসমিয়া বিনতে ইমাম তিশা, মেহেরাজুল হাসান, কাজী নুসরাত তাসনিম, অন্তরায় উমা ও কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ (নবম, দশম ও দ্বাদশ কার্যনির্বাহী কমিটির প্রকাশনা সম্পাদকগণ)

সূচিপত্র



4 জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখানোই যাদের লেখা
ফে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

জলবায়ু পরিবর্তন কতটুকু ক্ষতিকর
ফে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

27

13 মহাবিশ্ব নিঃসঙ্গ ভাষমান গ্রহ
অনিক কুমার সাহা

মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য
জোফির আহমেদ

32

16 মহাকাশের ভূত
হাবিয়ুর রহমান



চিত্রাঙ্কন
রোহান পাল

36

20 অ্যান্টিম্যাটারি কণা ইয়াং পিপল
ইন আ হাবি, সূর্যনা আক্তার

আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে
নুসরাত জাহান জাবাসমুম

37

22 Latin America : Aztecs, Maya and Inca
Astronomy in Ancient Times
Raissa Camelo

Dark Matter: An Unknown Truth
with Mysteries, Habibur Rahman

41

26 রহস্য
মোহাম্মদ নাহিদ আদনান



অপোয়ার যত রহস্য
মোহাম্মদ মুক্তাদির রহমান

47

26 জানতে ক্ষতি নেই
কাজি জামিয়া দিনতে ইমাম ভিখা

জ্যোতির্বিজ্ঞান

শেখানোই যাদের লেখা

কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

জ্যোতির্বিজ্ঞানকে বলা হয় জ্ঞানের সবচেয়ে প্রাচীন এবং চিরন্তন শাখা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আমাদেরকে সসীম পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে অসীম আকাশকে পরিমাপ করতে সাহস জোগায়। আকাশের সেই দূরন্ত নক্ষত্ররাজিকে জয় করার অদম্য বাসনা নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান আজও আমাদের সামনে এক বিস্ময়কর জানালা খুলে দেয়। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থীই জ্যোতির্বিজ্ঞানী হতে চায়; কিন্তু দিকনির্দেশনার অভাবে তাদের এ স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘কোপার্নিকাস অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল মেমোরিয়াল অব সাস্ট’ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার এ যাত্রা নিয়েই কাজ করে।



স্বপ্নের বীজ রোপন

আমাদের সংগঠনের উপদেষ্টা মাহামুদ হাসান সবসময় একটা কথা আমাদের বলেন, প্রদীপ পুরো ঘরকে আলোকিত করলেও সবচেয়ে বেশি অন্ধকার থাকে প্রদীপের নিচেই। বিশ্ববিদ্যালয় যদি আমাদের প্রদীপ হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশের স্কুল-কলেজ বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা যাতে আঁধারে থেকে না যায়, তারা যাতে আলোর সন্ধান পায়, স্বপ্ন দেখে তা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।

তাই স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম-সাস্ট কসম্যানিয়া নামক একটি স্কুল প্রোগ্রামের আয়োজন করে থাকে। ক্যাম-সাস্টের সদস্যরা ফেলনা বোতল ও পানিকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে উড়তে পারে এমন একটি রকেট বানিয়েছেন। এ রকেটটি উৎক্ষেপন করে শিক্ষার্থীদের শেখানো হয় একটি রকেট কীভাবে কাজ করে। এছাড়াও থাকে পেপার প্লেন কম্পিটিশন। কাগজ দিয়ে শিক্ষার্থীরা কাগজের বিমান বানিয়ে প্রতিযোগিতা করে। এখন পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের তৈরি করা কাগজের বিমানের রেকর্ড দূরত্ব ৭৮.৩ ফুট। এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অ্যারোডাইনামিক্সের মূলতত্ত্ব শিখতে পারে। এছাড়াও স্কুল প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীদেরকে জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখানোর জন্য থাকে প্রেজেন্টেশন ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো শুনলেই জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাদের তুমুল আগ্রহের কথা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

চিত্র। স্কুলের শিক্ষার্থীরা পেপার প্লেন কম্পিটিশনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে অ্যারোডাইনামিক্সের মূলতত্ত্ব শিখছে





চিত্র | রাগিব রাবেয়া প্রাইমারি স্কুলে লুনার ভিআর দিয়ে চাঁদে দাঁড়িয়ে মহাবিশ্বকে দেখছে একজন শিক্ষার্থী।

আমার স্পষ্ট খেয়াল আছে এবছরই আমরা দুটি স্কুলে গিয়েছি বাচ্চাদেরকে জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখানোর জন্য। একটি হচ্ছে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে বাংলাদেশ-ভারত বর্ডারঘেষা একটি স্কুল। বর্ডারঘেষা অঞ্চল হওয়ায় ঐ অঞ্চলে মাদকের চোরাচালান থেকে শুরু করে নানা অপরাধ অহরহ সংঘটিত হয়। অনেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর ঝরে পরে আর হাইস্কুলের গন্ডি পেরিয়ে খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীই কলেজ অর্থাৎ যেতে পারে। অন্য আরেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে তারাপুর চা বাগানের মধ্যে, রাগিব রাবেয়া প্রাইমারি স্কুল। চা বাগানের শ্রমিকদের সন্তানরাই অধিকাংশ এ স্কুলের শিক্ষার্থী। যাদের পেটে ক্ষুদ্রা, পরিবারে অর্থের অভাব, মুখে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা স্পষ্ট তাদের কাছে ক্যাম ছুটে যায়। ক্যাম চায় তারা স্বপ্ন দেখুক, শিকল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসুক। আর স্বপ্ন দেখাতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চেয়ে ভালো অন্য কোনো বিষয় আমার কাছে জানা নেই।

২০১৮ সালে যে টিম অলিক নাসা স্পেস অ্যাপ চ্যালেঞ্জে বিশ্বজয় করে সে দলের সদস্যরাও ক্যাম-সাস্টের অংশ ছিলেন। তাদের তৈরি করা সে প্রজেক্ট 'লুনার ভিআর' তারা ক্যাম-সাস্টকে দিয়ে গিয়েছেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা চাঁদে দাঁড়িয়ে মহাবিশ্বকে দেখার সুযোগ পায়।



নিয়মিত পাঠচক্র

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহীরা সাধারণ পপসায়েন্সের বই কিংবা বিভিন্ন পত্রিকা/সাময়িকীর লেখা পড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখার চেষ্টা করে। কিন্তু এই শেখা মূলত তাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গভীরতা অনুভব করাতে পারে না এবং গবেষণার জন্য যোগ্য করে তুলতে পারে না। তার জন্য দরকার জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যবই পড়া, অনুধাবন করা এবং তা কাজে লাগানো।

জ্যোতির্বিজ্ঞানকে এভাবে শেখার জন্যই ক্যাম-সাস্ট আয়োজন করে থাকে নানা পাঠচক্র। পাঠচক্রের আলোচনার বিষয়বস্তু পূর্বনির্ধারিত হয়। এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীরা আগে থেকেই পড়ে আসার চেষ্টা করেন। পাঠচক্রে সবাই কী কী শিখেছে তা নিজেদের মাঝে শেয়ার করেন এবং এর মাধ্যমেই জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হয়ে আসে।

ক্যাম-সাস্ট ইতিমধ্যেই অর্ধশতাধিক অনলাইন ও অফলাইন পাঠচক্রের আয়োজন করেছে। এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে কীভাবে জানতে পারলাম আমাদের পৃথিবী সমতল নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তোলা ছবি কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়, আইসটাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি, টেলিস্কোপের মাউন্টিং কীভাবে করতে হয়, রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞান, ব্ল্যাকহোল, মহাবিশ্বে এলিয়েন থাকার সম্ভাবনা কতটুকু, জ্যোতির্বিজ্ঞানে কেন প্রোগ্রামিং লাগে ইত্যাদি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও নতুন করে পাঠচক্রে সংযোজন করা হয়েছে মুভি নিয়ে নানা বিশ্লেষণ। ইন্টারস্টেলার কিংবা দ্যা মার্শিয়ানের মতো মুভিতে কতটুকু বিজ্ঞান আছে, সেখানের বিজ্ঞান বিজ্ঞানীদের দেওয়া তত্ত্বের সাথে কতটুকু মিলে, এছাড়াও মুভিতে উল্লেখ করা নানা দর্শন নিয়েও আলোচনা হয় মুভি সার্কোলে।

চিত্র - টেলিস্কোপ মাউন্টিং শেখানোর জন্য আয়োজিত একটি নিয়মিত পাঠচক্র



চিত্র | অ্যাস্ট্রো
কার্নিভালে অংশ নেওয়া
শিক্ষার্থীদের একাংশ



অ্যাস্ট্রো কার্নিভাল

স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে দিনব্যাপী অ্যাস্ট্রোকার্নিভাল আয়োজন করে ক্যাম-সাস্ট। এ কার্নিভালে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক নানা উৎসবে মেতে উঠে।

কার্নিভালের অংশ হিসেবে থাকে নিউরণ টিজার কুইজ প্রতিযোগিতা, পোস্টার প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতা, অ্যাস্ট্রোনমি বিষয়ক মুভির ব্যাখ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সাথে কথা বলা ও তাদের দেখে অনুপ্রাণিত হওয়া, টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশকে দেখা ও মহাবিশ্বকে চিনতে শেখা।

চিত্র | অ্যাস্ট্রো কার্নিভালে
একজন শিক্ষার্থীর তৈরি
করা সৌরমডেল



অ্যা স্ট্রো কো ড ই ন্টে গ্রি ভ

বর্তমানে অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীই ডাটা নিয়ে কাজ করেন। বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ডাটার সহজলভ্যতার জন্য ও সবার হাতের নাগালে একটি কম্পিউটার থাকার দরুন অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীই এনালাইটিক্যাল সলিউশন না খুঁজে বরং ডাটা থেকে প্রেডিষ্ট করার চেষ্টা করেন। এর জন্য ক্যাম-সাস্ট থেকে নানা কর্মশালা ও সেশনের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

চিত্র | অ্যাস্ট্রোকোডে অংশগ্রহণকারীদের একাংশকে গবেষণা বিষয়ক প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে

এবছরের শুরুতে এমনই একটি প্রোগ্রামিং নির্ভর জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা শেখার কর্মশালা ‘অ্যাস্ট্রোকোড ইনটেনসিভ’ আয়োজন করে ক্যাম-সাস্ট। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কেবলমাত্র ৩০ জনকে আবেদন করে এ কর্মশালায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এ কর্মশালায় পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষা শেখানো হয় এছাড়াও কীভাবে অ্যাস্ট্রোমেট্রিকা ও প্যান-স্টার্স টেলিস্কোপের ডাটা ব্যবহার করে গ্রহাণু আবিষ্কার করতে হয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তোলা ছবি থেকে কীভাবে নয়েজ রিডাকশন করতে হয় এবং গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং থেকে কীভাবে ডার্ক ম্যাটারের তথ্য পাওয়া যায় তা শেখানো হয়েছে।

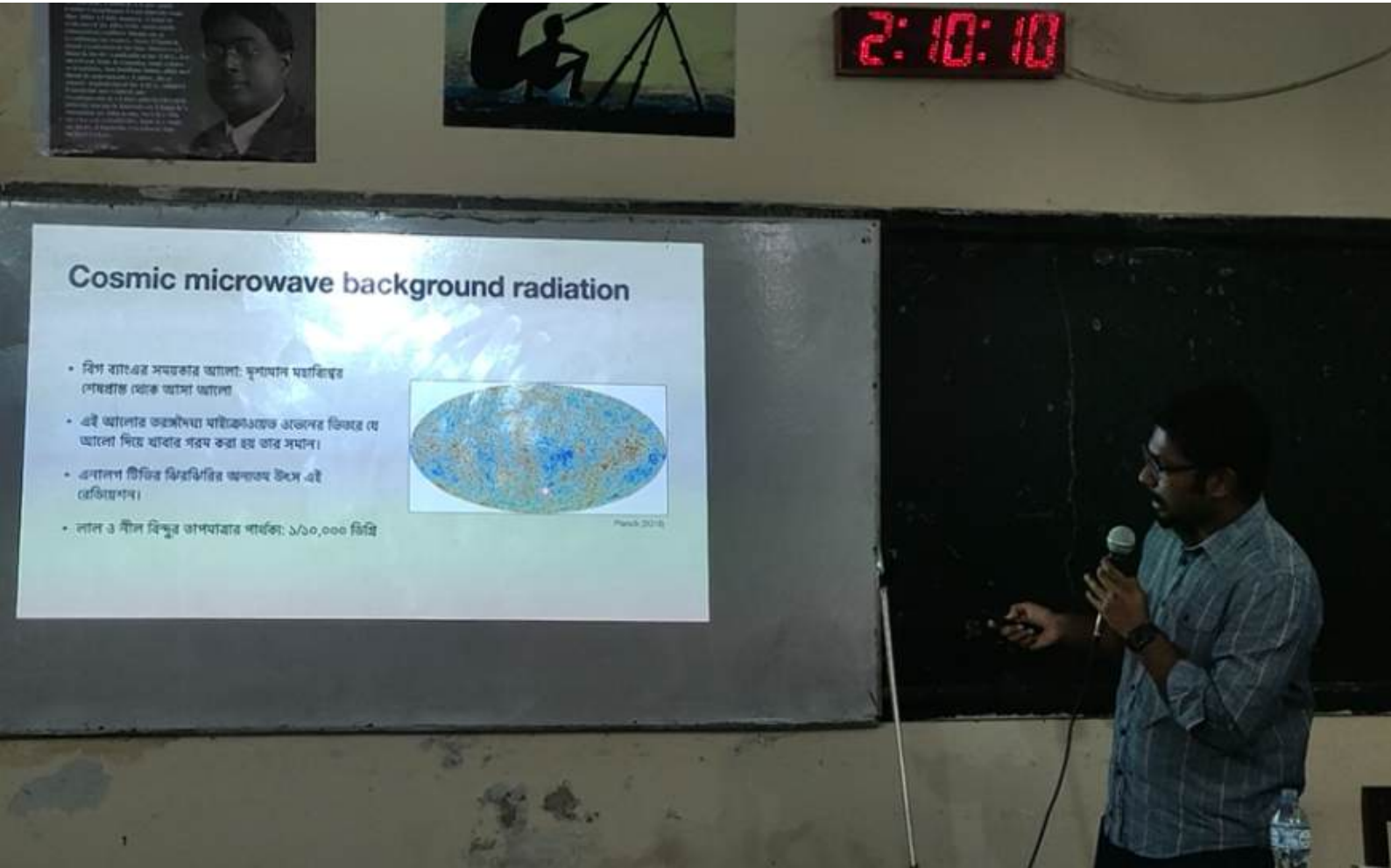


ক্যাম - ট ক

বাংলাদেশে অনেক শিক্ষার্থীই জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় আগ্রহী থাকে। তবে যথাযথ দিকনির্দেশনা ও সহায়তা না পাওয়ায় তারা নিজেরা চেষ্টা করেও খুব একটা আগাতে পারে না। এক্ষেত্রে ক্যাম-সাস্ট একটি বন্ধুসুলভ কমিউনিটি হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশী ও বিদেশী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সাথে পরিচয় ও কাজ করার সুযোগ তৈরি হয় এ কমিউনিটির মাধ্যমে।

চিত্র | ক্যামটকে ‘মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ হার বিষয়ক রহস্য’ নিয়ে কথা বলছেন নাসা আইসটাইন ফেলো ও বাংলাদেশী জ্যোতির্বিজ্ঞানী আনওয়ার জামান সজীব।

বাংলাদেশী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সাথে পরিচয় ও তাদের গবেষণার ব্যাপারে জানার জন্য ক্যাম-সাস্ট থেকে ক্যাম-টকের আয়োজন করা হয়। ক্যাম-টকে বক্তা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশী জ্যোতির্বিজ্ঞানী খান মুহাম্মদ বিন আসাদ, লামিয়া আশরাফ মাওলা, লামমিম আহাদ, আনওয়ার জামান সজীব, মুনজেরিন রেজা প্রমুখ। এসব আলোচনায় উঠে আসে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব, গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং, জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ দিয়ে গ্যালাক্সিকে দেখা, মহাবিশ্ব থেকে আসা রেডিও সিগন্যাল কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় মেশিন লার্নিং-এর ব্যবহার।



নতুন গ্রহাণু শনাক্ত করলেন শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা

বিজ্ঞানবিজ্ঞান প্রতিবেদক

আপডেট: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৭:০৫:৪



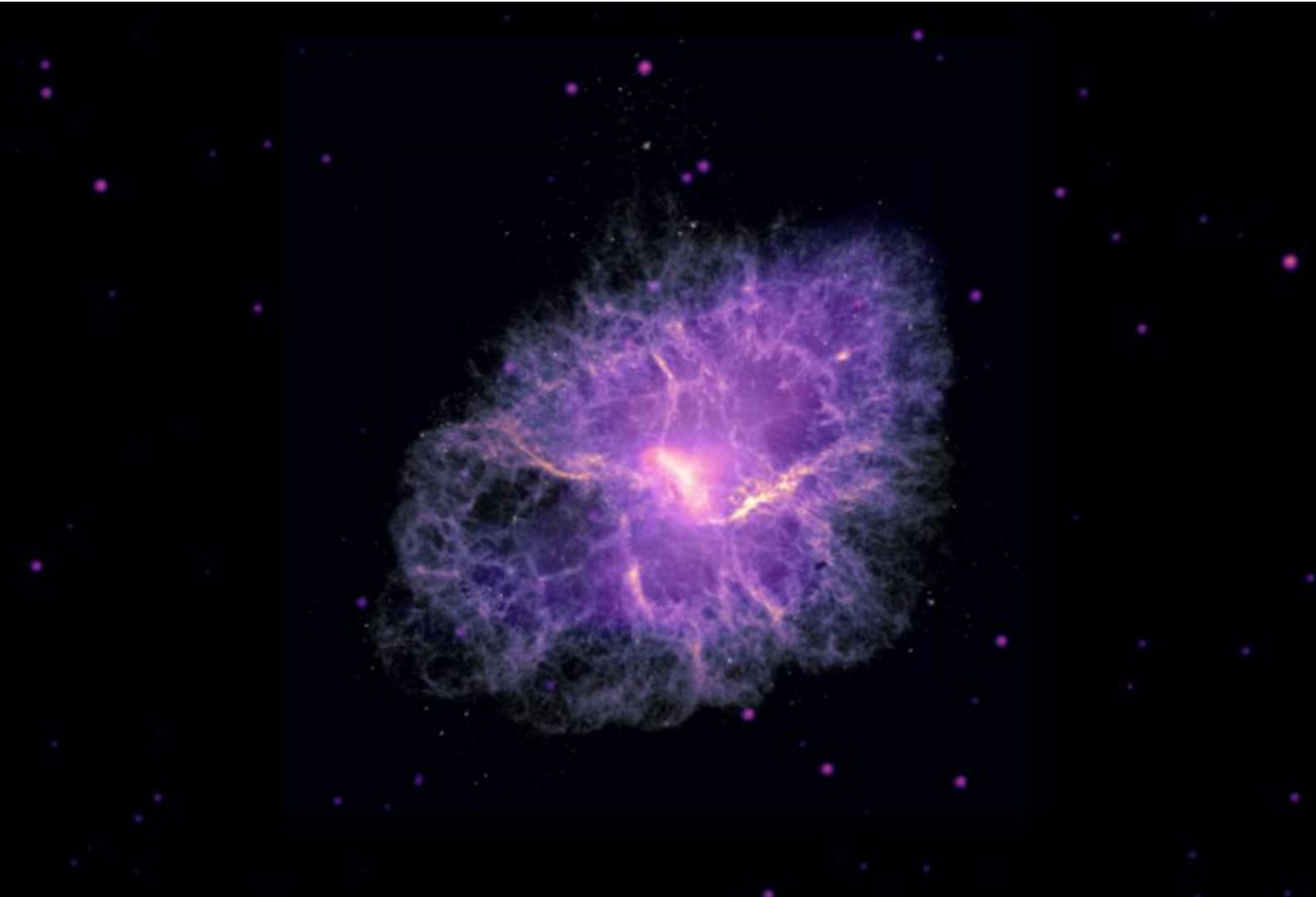
প্রিলিমিনারি গ্রহাণু খুঁজে পাওয়া মনোর পাঁচ সদস্য (বাম থেকে) সানিয়া তাসনিম মীম, চঞ্চল রায়, কে. এম. শহীদুল উল্লাহ, সানিউল ইসলাম মুন্স, কাজী নুসরাত তাসনীম

চিত্র | নাসা অ্যাস্ট্রোফটো চ্যালেঞ্জ স্ট্যান্ডআউট এন্ট্রি হিসেবে সম্বোধন পাওয়া তন্ময় ভৌমিকের তোলা ক্রাব নেবুলার ছবি

ক্যামের সদস্যরাও ওপেন এক্সেস ডাটা নিয়ে কাজ করেছেন এবং সামনেও করবেন। এই পর্যন্ত ক্যাম-সাস্টের সদস্যরা চারটি প্রজেক্ট করেছেন। প্রজেক্টগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইমেজ প্রসেসিং, ডাটা এনালাইসিস, মডেল ফিটিং, অপটিমাইজেশন বিষয়ক।

২০১৮ সালে নাসা স্পেস অ্যাপ চ্যালেঞ্জে বিশ্বজয়ী দল 'টিম অলিক' এর সদস্যরাও ক্যামের সদস্য ছিলেন। প্যান-স্টারস টেলিস্কোপের কোলাবোরেশনে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্টেরয়েড সার্চ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে টেলিস্কোপের সাহায্যে তোলা বিভিন্ন ছবিকে অ্যাস্ট্রোমেট্রিকা নামে একটি সফটওয়্যারের সাহায্যে এনালাইসিস করে গ্রহাণু খুঁজে বের করতে হয়। এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ক্যাম-সাস্টের সদস্যরা এখন পর্যন্ত ৮টি এমন প্রিলিমিনারি গ্রহাণু আবিষ্কার করেছেন।

আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান কম্পিটিশনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ক্যামের সদস্যরা সিলভার ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছেন। এছাড়াও ইউনিভার্সিটি ফিজিক্স কম্পিটিশন নামে পদার্থবিজ্ঞানের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে ক্যামের সদস্যরা ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছেন।



নাসা অ্যাস্ট্রোফটো চ্যালেঞ্জ মাইক্রোঅবজার্ভেটরির সাহায্যে একটি ছবি তোলা লাগে। পরবর্তীতে সে ছবি নানা সফটওয়্যার ও প্রোগ্রামিং-এর সাহায্যে প্রসেসিং করে একটি রঙিন ছবিতে রূপান্তর করা হয়। সে প্রতিযোগিতায়ও ক্যামের সদস্য তন্ময় ভৌমিকের ছবি স্ট্যান্ডআউট এন্ট্রি হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্থান পেয়েছে। ক্যাম-সাস্টের সদস্যদের মধ্যে আহমাদ আল ইমতিয়াজ ২০২৩ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হওয়া ASTRO101: Hands-On Workshop on Optical Astronomy Research 2023 এ অনুষ্ঠিত হওয়া হ্যাকাথনে অংশ নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বর্তমানে এর সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েই পিএইচডি করছেন, কেউ বা রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট বা ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করছেন কেউ বা পোস্টডক গবেষকদের সাথে কাজ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা শিখছেন।

চিত্র | ২০১৮ সালে
নাসা স্পেস অ্যাপস
চ্যালেঞ্জ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন
টিম অলিক



বুধশক্তিধর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৩০ মাস ১৪০১

দৈনিক
ইতিফাক



বাংলা কনটেন্ট | ই-পেপার | অর্কিভ | English


সর্বশেষ বিশেষ সংবাদ জাতীয় সারাদেশ রাজনীতি বিশ্ব সংবাদ খেলা বিনোদন অর্থনীতি লাইফস্টাইল টেক আইন-আদালত ভিডিও মতামত অন্যান্য

নাসার প্রতিযোগিতায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশ : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ১৬:২১





মহাবিশ্বে নিঃসঙ্গ ভ্রাসমান গ্রহ

অনিক কুমার সাহা |

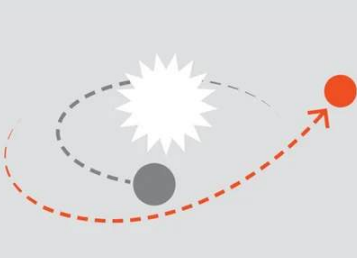
নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ব মানে হলো একা চলাচল করা। মাঝে মাঝে আমাদের সবারই নিঃসঙ্গতার প্রয়োজন হয়, কিন্তু আমরা বেশি দিন একা থাকতে পারি না; আমাদের কারো না কারো দরকার হয়। এই বিশাল মহাবিশ্বেও কিছু বস্তু দেখা যায় যারা এই অনন্ত শূন্যে একাই ভেসে বেড়ায়। এই বস্তুগুলোর মধ্যে একটা বস্তু হলো ভাসমান গ্রহ। মানুষ নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না কিন্তু এই গ্রহ গুলো বিলিয়ন বিলিয়ন বছর একা, নিঃসঙ্গ থাকে। এই সকল গ্রহগুলো কোনো তারাকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে না। তাই এদের বলে ভাসমান গ্রহ, তারাবিহীন গ্রহ বা আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্রহ আর ইংরেজিতে বলে ROGUE PLANET.

ভাসমান গ্রহ বা Rogue Planet মহাবিশ্বের একটা বিস্ময়। ধারণা করা হয় আমাদের আকাশ গঙ্গা বা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে ৫০ বিলিয়ন ভাসমান গ্রহ আছে। এখন কিছু প্রশ্ন এসে যায় যে এই ভাসমান গ্রহ কী এবং এরা এলোইবা কোথা থেকে? ভাসমান গ্রহ মানে হলো যে সকল গ্রহ কোনো তারাকে কেন্দ্র করে ঘোরে না। এখন পর্যন্ত Rogue Planet বা ভাসমান গ্রহ সম্পর্কে খুব কম তথ্যই জানা গেছে। তবে এখন পর্যন্ত যত rogue planet পাওয়া গেছে তাদের সবার ভর বৃহস্পতি গ্রহের ভরের চেয়ে বেশি। এ থেকে ধারণা করা হয় এই গ্রহগুলো বেশির ভাগই নিভে যাওয়া বামন নক্ষত্র (brown dwarf)।

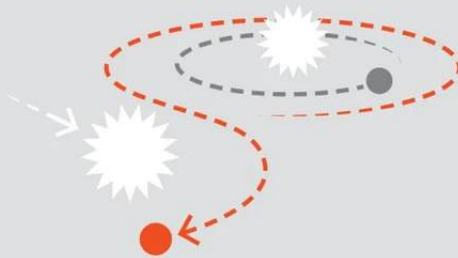
আমরা সবাই জানি, নীহারিকা থেকেই তারার জন্ম হয় কিন্তু তারা জন্মের সময় এমন কিছু নক্ষত্রের উদ্ভব হয় যারা তাদের কম ভরের কারণে নিজের ভেতর নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম হয় না। তারাই পরবর্তীতে এই rogue planet বা ভাসমান গ্রহে পরিণত হয়। কিন্তু সম্প্রতিকালে পৃথিবীর ভরের সমান গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এরা কোনো নিভে যাওয়া নক্ষত্র নয় এদের আচরণ পাথুরে গ্রহের মতো, গ্যাসীয় গ্রহের মতো নয়।

ধারণা করা হয় কোনো তারাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে ঘুরতে এরা তারার মহাকর্ষ থেকে ছুটে গেছে আর ছুটে অনন্ত মহাকাশে একাকী ভেসে বেড়াচ্ছে। এমনই একটি গ্রহ হলো PSO -J318.5-22, এই গ্রহটি পৃথিবী থেকে ৮০ আলোকবর্ষ দূরে এবং বৃহস্পতি থেকে ৬ গুণ ভারী। এটি কোনো বামন নক্ষত্র নয়, এটি একটি গ্রহ। এই সকল গ্রহগুলোকে শনাক্ত করার জন্য বর্তমানে অনেক গবেষণা হচ্ছে। যেমন একটি প্রকল্প হলো OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) এই প্রকল্পের আওতায় এখন পর্যন্ত অনেক গ্রহ ধরা পরেছে। যেমন : OGLE -2012-BLG-1323, OGLE-2017-BLG-0560.

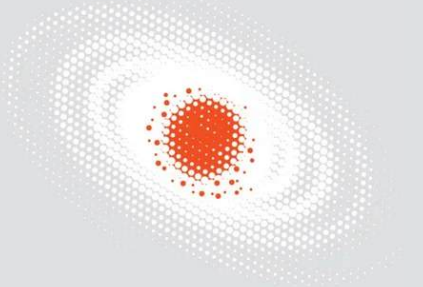
চিত্র। ভাসমান গ্রহ তৈরি হওয়ার তিনটি প্রক্রিয়ার কথা বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন।
© ক্রিস ফিলপটের মূল চিত্র সম্পাদিত ও ভাষান্তর



দানব আকৃতির একটি গ্রহ ছোট অন্য কোনো একটি গ্রহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কক্ষচ্যুতি ঘটতে পারে



একাধিক নক্ষত্রের উপস্থিতিতে কোনো গ্রহ তার কক্ষপথ থেকে ছিটকে যেতে পারে



মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা গ্যাস ধূলিকণা জড়ো হয়ে নিজ থেকে একটি গ্রহ তৈরি হতে পারে

তাছাড়া NASA এই ভাসমান গ্রহগুলোকে আরো ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য ন্যাসি গ্রেন্স রোমান স্পেস টেলিস্কোপ মহাকাশে পাঠাবে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো যে গ্রহ কোনো তারাকে কেন্দ্র করেই ঘোরে না তাকে ধরা সম্ভব কীভাবে?

উত্তরটা একটু কঠিন। ধরা যাক একজন লোক অন্ধকারে একা হেঁটে যাচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা তাকে সহজে দেখতে পাবো না। কিন্তু আমরা যদি নাইট ভিশন দিয়ে বা থার্মাল ক্যামেরা দিয়ে তাকাই তবে আমরা তাকে শনাক্ত করতে পারবো। ঠিক একই ভাবে যেহেতু এরা বেশিরভাগই নেভানো বামন তারা তাই এদের থেকে সামান্য তাপ নির্গত হয়। এই তাপের নির্গমন থেকেই এদের শনাক্ত করা যায়। কিন্তু এদের থেকে নির্গত তাপের পরিমাণ খুব কম তাই মাত্র ১০০০ AU (Astronomical Unit) এর মধ্যে থাকা গ্রহগুলোই এভাবে ধরা যায়। আবার যদি সেটা পৃথিবীর ভরের গ্রহ হয় তবে তা থেকে তাপও নির্গত হয় না। তাই এই সকল rogue planet ধরার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো গ্র্যাভিটেশনাল মাইক্রোলেন্সিং পদ্ধতি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই গ্র্যাভিটেশনাল মাইক্রোলেন্সিংটা কী? আমরা জানি কোনো বেশি ভরের বস্তু কম ভরের বস্তুকে আকর্ষণ করে আর ভর যদি অনেক বেশি হয় তবে তা আলোকেও আকর্ষণ করে। কোনো নক্ষত্রের সামনে যদি কোনো ভারী বস্তু চলে আসে তবে সামনের ভারী বস্তুর কারণে পেছনের নক্ষত্রের আলো বেঁকে যায় যার ফলে পেছনের নক্ষত্র কিছু সময়ের জন্য বেশি উজ্জ্বল দেখায়। এই পদ্ধতিটা অনেকটা মাইক্রোস্কোপের মতো। এই পদ্ধতিটাকেই বলে গ্র্যাভিটেশনাল মাইক্রোলেন্সিং।

এই পদ্ধতির সাহায্যে অতি সহজে এই গ্রহগুলোকে ধরা যায়। এই গ্রহগুলোকে নিয়ে নানা ধারণা চলমান আছে যেমন অনেকে মনে করেন এই সকল rogue planet-দের মধ্যে যেগুলো পৃথিবীর মতো তাতে প্রাণও থাকতে পারে।

কারণ যদি এদের কেন্দ্র জ্বলন্ত থাকে তাহলে এটি অনন্ত অন্ধকারেও আণুবীক্ষণিক প্রাণ রাখার মতো শক্তি যোগাবে। আর তাছাড়া এসকল গ্রহ হঠাৎ করেই অন্য সৌরজগতে ঢুকে পরে। আর অন্য গ্রহের সাথে সংঘর্ষ ঘটায়। তবে এটা নিশ্চিত এদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলে মহাবিশ্বের একটি অদেখা জগত সম্পর্কে আরো ধারণা পাওয়া যাবে। বোঝা যাবে অনন্ত এই অন্ধকার অদেখা মহাবিশ্বে আসলে কী আছে, আর হয়তো প্রাণের রহস্যেরও সমাধান পাওয়া যাবে। [সাই নিউজ ও উইকিপিডিয়ার সূত্র ধরে লেখা]

চিত্র | রাতের আকাশে শুক্র গ্রহের চেয়ে ১০০ বিলিয়ন গুন অনুজ্জ্বল প্রথম আবিষ্কার হওয়া ভাসমান গ্রহ PSO J318.5-22 © প্যান-স্টারস টেলিস্কোপ ও উইকিমিডিয়া

নিঃসঙ্গ ভাসমান গ্রহ
PSO J318.5-22



মহাকাশের ডুত

হাবিবুর রহমান

আমাদের মধ্যে আকাশ দেখতে পছন্দ করে না, এমন মানুষ খুব কমই আছে। আর যদি হয় তারা ভরা রাতের আকাশ তাহলে আমরা একটু বেশিই আবেগে আত্মতৃপ্ত হয়ে যাই। আর এই তারাগুলো নিয়ে আমাদের আগ্রহেরও কমতি নেই। কখনও কি লক্ষ্য করেছেন, আকাশের এই তারাগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ তারাগুলোই আপেক্ষিকভাবে স্থির থাকলেও কিছু তারা আছে যেগুলো মিটমিট করে জ্বলে। এসব তারার মিটমিট করা দৃশ্য আমরা খালি চোখেই দেখতে পাই। তবে কিছু তারা আছে যাদের মিটমিট করা দৃশ্য খালি চোখেও দেখা যায় না। এদেরকে বলা হয় পালসার নক্ষত্র।



সৃষ্টির সবকিছু তার জীবন শেষ হওয়ার আগে, তার উত্তরসূরী রেখে যায়। ঠিক তেমনই নক্ষত্র সুপারনোভার মাধ্যমে ধ্বংস হওয়ার সময় তার উত্তরসূরী রেখে যায়। তার একটি প্রকার হলো নিউট্রন তারা।

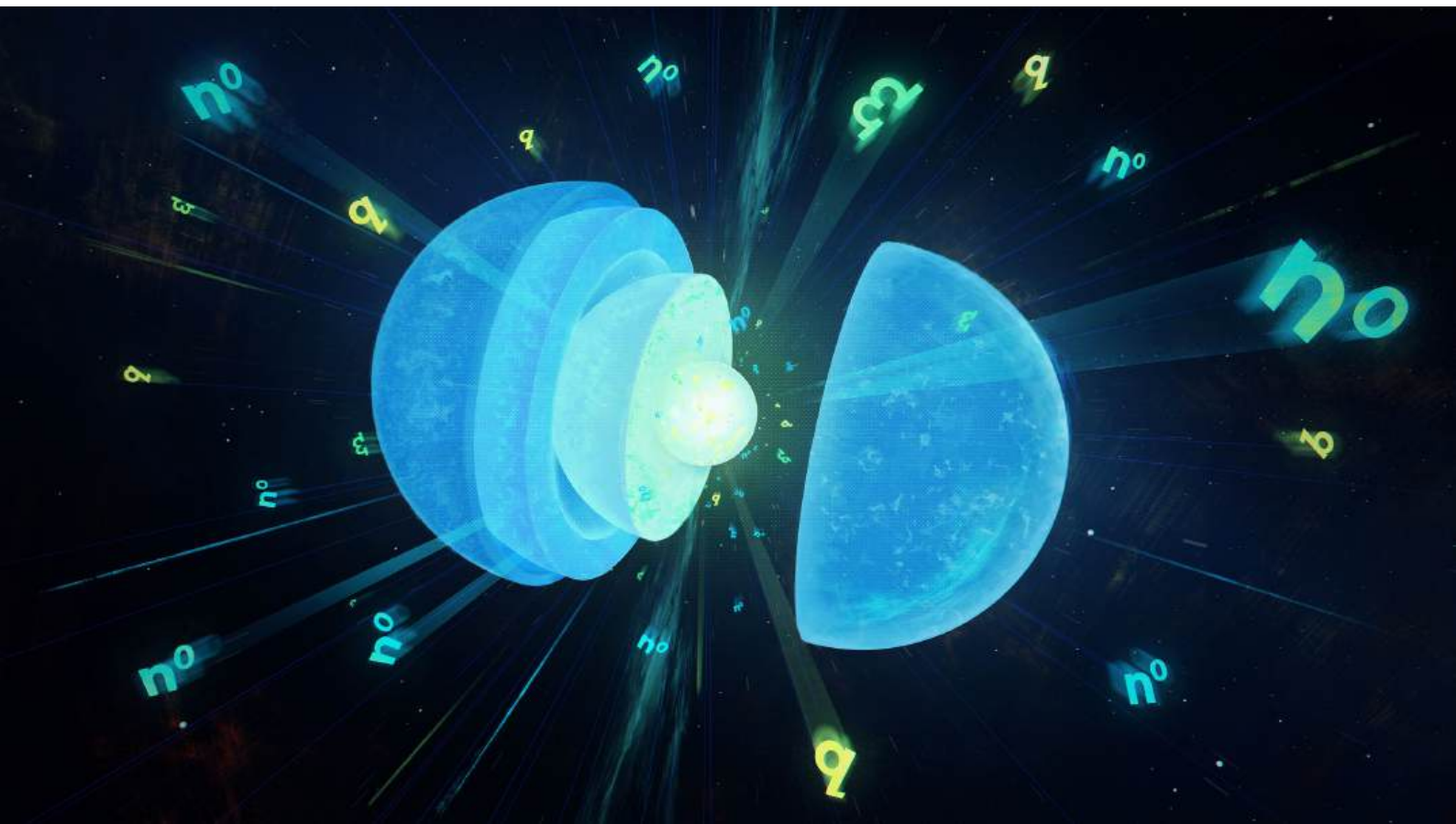
একটু বিস্তারিতভাবে বলা হয় তাহলে, যে-কোনো ধরনের নক্ষত্রের মধ্যে ক্রমাগত নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া হচ্ছে। যার কারণে নক্ষত্রগুলো ক্রমাগত শক্তি এবং আলো বিকিরণ করে। একটা পর্যায়ে এসে আর শক্তি বিকিরণ করা সম্ভব হয় না। তখন এদের মধ্যে সংকোচন ঘটে মহাকর্ষ বলের প্রভাবে।

এই গোলকের ভর যদি সূর্যের ভরের প্রায় ১.৪ গুণের বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ চন্দ্রশেখর (White Dwarf) লিমিট অতিক্রম করে ফেলে, তখন গোলকটি সংকুচিত হতে হতে নিউট্রনের তৈরি বলে পরিণত হয়।

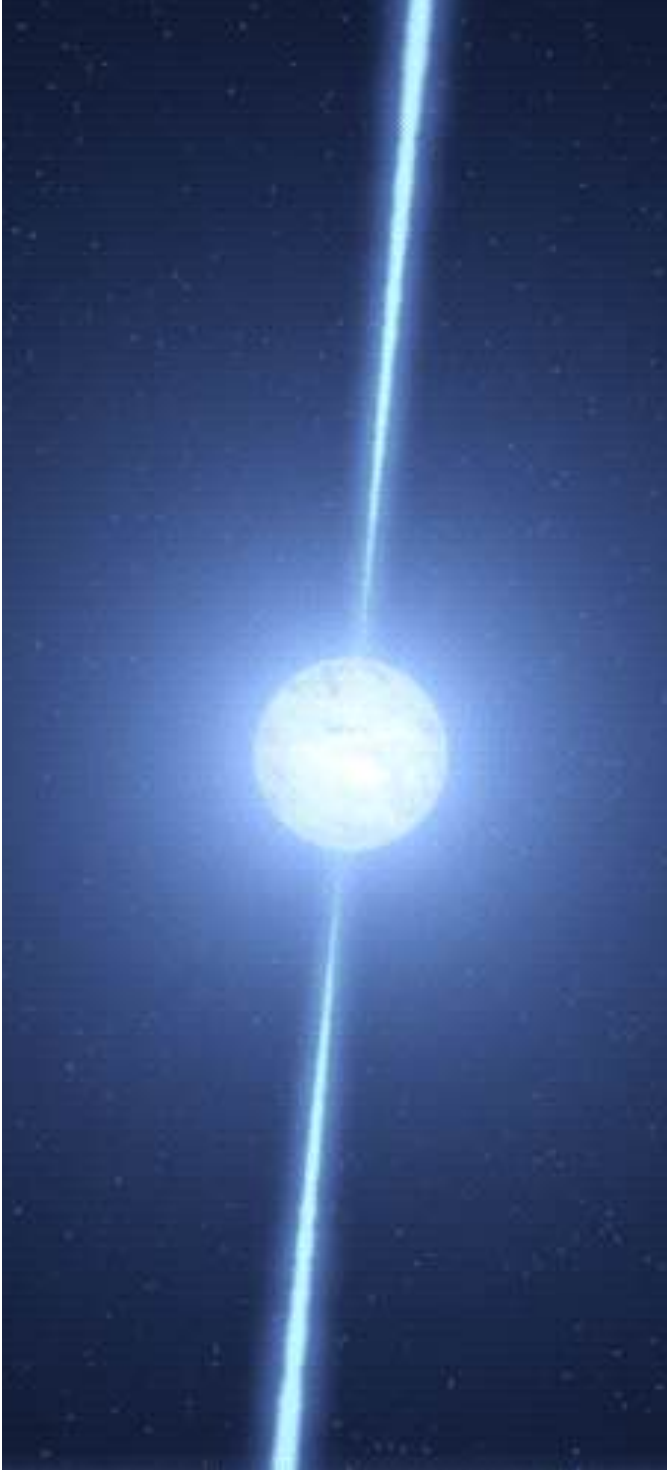
তো নক্ষত্রের কেন্দ্র এখন নিউট্রন স্টার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবাক করার মতো বিষয় হচ্ছে, নক্ষত্রটি সংকুচিত হতে হতে এর ব্যাস ২০ কিলোমিটারের ভিতরে হলেও এর ভর সূর্যের চেয়ে ১.৪ গুণের থেকেও বেশি। খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে নক্ষত্রটির ঘনত্ব কী পরিমাণ বেশি! কীভাবে এত ছোটো জায়গায় এই বিশাল পরিমাণ ভর থাকে? এখন চলুন, বিষয়টাকে আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করি।

একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যেই এর মূল ভর থাকে। পরমাণুর বেশিরভাগ জায়গাই ফাঁকা কিন্তু নিউট্রন তারার ক্ষেত্রে বিষয়টা ভিন্ন। নিউট্রন তারার বেশিরভাগ জায়গাই নিউট্রন দিয়ে পূর্ণ। অর্থাৎ পরমাণুর ফাঁকা স্থানের যে আয়তন সেটি নিউট্রন স্টারে থাকে না। এজন্যই এত আয়তনে ছোটো হলেও এর ভর এত বেশি। এখন প্রশ্ন করতে পারেন, এইসব বলার কারণ কী এখানে! তাহলে দেখুন, সুপারনোভার আগে নিউট্রন স্টারের স্পিন কম থাকে। কিন্তু সুপারনোভার পর এর স্পিন অনেক বেড়ে যায়।

চিত্র। একটি নিউট্রন স্টারের ঘনত্ব এবং ঘূর্ণন গতি প্রচণ্ড বেশি হয়।
© মাসিয়েজ রেবিসজ, কোয়ান্টা ম্যাগাজিন



চিত্র | পালসার একধরনের বিশেষ
নিউট্রন স্টার যার দুই চুম্বক মেরু
থেকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণ
বের হয়। © নাসা সায়েন্টিফিক
ভিজুয়লাইজেশন স্টুডিও



কারণ সুপারনোভার আগে নিউট্রন স্টারটির ভর বেশি থাকে। কিন্তু সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর সংকুচিত হতে হতে এর ভর অনেক কমে যায়। কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার নীতি অনুসারে, “কোনো বস্তুর ওপর টর্কের লব্ধি শূন্য হলে বস্তুটির কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে।” অর্থাৎ, যেহেতু ভর কমে গিয়েছে তাই সংরক্ষণশীলতা ধরে রাখার জন্য এর স্পিন অনেক বেড়ে যায়।

সুপারনোভার আগে যেখানে সপ্তাহে একবারের মতো স্পিন করত, সেখানে সংকুচিত হতে হতে এর ব্যাস ২০ কিলোমিটারের ভিতর হয়ে যাওয়ায় এর স্পিন অনেক বেড়ে সেকেন্ডে ৬০০ থেকে ৭০০ বার হতে পারে। এর পাশাপাশি এর ম্যাগনেটিক ফিল্ডও শক্তিশালী হয়ে যায়। এর ম্যাগনেটিক ফিল্ড পৃথিবীর চেয়ে ১০০ মিলিয়ন থেকে ১ কোয়াদ্রিলিয়ন গুণ শক্তিশালী।

এখন আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারেই যে নিউট্রন স্টারের ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে কেন? এখানে তো কোনো চার্জিত কণা নেই। আসলে নিউট্রন স্টার পুরোটাই নিউট্রন দিয়ে তৈরি নয়। এর মধ্যে প্রায় ১০% ইলেকট্রন এবং ১০% প্রোটন থাকে। এই চার্জিত কণাগুলো, নিউট্রন স্টারের স্পিনের ফলে চলমান হয়, যার ফলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সৃষ্টি হয়।

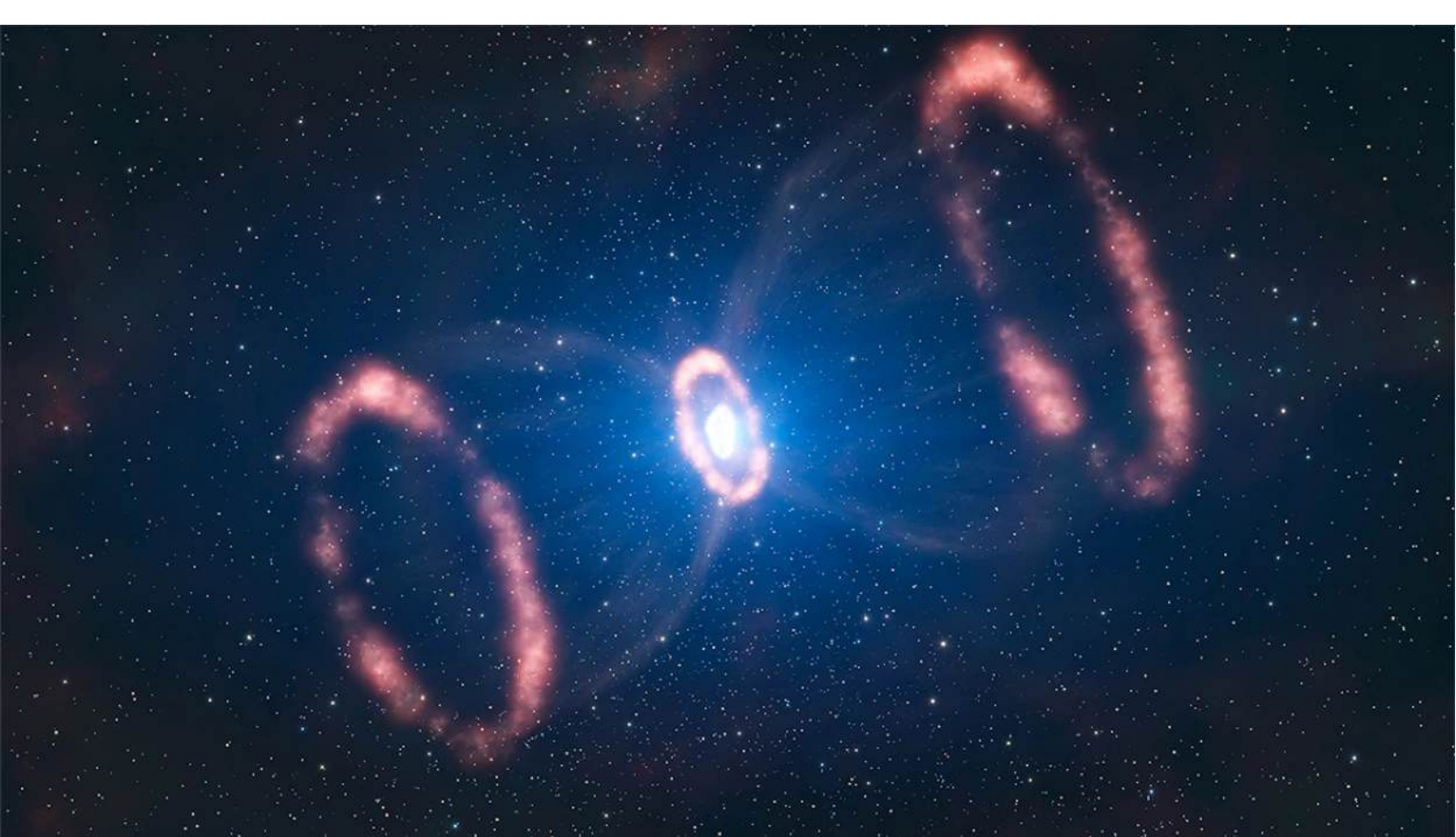
আর এই নিউট্রন স্টারের মধ্যে একটা ধরণ হচ্ছে পালসার। নিউট্রন স্টার যখন তার ম্যাগনেটিক ফিল্ডসহ খুব দ্রুত ঘুরতে থাকে, তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দুই পোল থেকে আলোর বিকিরণ ঘটে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন হিসেবে। নিউট্রন স্টারের অক্ষ এবং দুই ম্যাগনেটিক পোল একই সরলরেখায় থাকে না বলে দ্রুত ঘোরে এবং আলোক রশ্মি বিকিরণের ফলে নিউট্রন স্টারকে লাইটহাউজের মতো পৃথিবী থেকে ঝিকমিকি করতে দেখা যায়। একেই পালসার বলে। সাধারণত এই পালসারের স্পিন সাইকেল হয় ১-২ সেকেন্ডের। অর্থাৎ খুব দ্রুত এবং অল্প সময়ের জন্য শক্তি বিকিরণ করে।

কিছুদিন আগে, পালসারের সদৃশ এক বস্তু আবিষ্কার করা হয়েছে, পৃথিবী থেকে প্রায় ৪০০০ আলোক বর্ষ দূরে কিন্তু এই বস্তুটির স্পিন সাইকেল ১৮ মিনিট। অর্থাৎ অনেক ধীরে এবং অনেক বেশি সময়ের জন্য শক্তি বিকিরণ করছে। যার জন্য বিজ্ঞানীরা একে ভৌতিক বস্তু বলেও আখ্যায়িত করেছেন (প্রায় ১ মিনিট ধরে শক্তি বিকিরণ অনেকটাই অসম্ভব)। আবার প্রায়ই এটি কয়েক ঘণ্টার জন্য পর্যবেক্ষণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এমনটি কেন হচ্ছে তার সঠিক কোনো ব্যাখ্যা আপাতত নেই। মহাকাশে এমন অনেক বস্তু রয়েছে, যারা শক্তি কিংবা আলো নির্গমন করছে। এবং বিজ্ঞানীরা তা রেকর্ড রাখছেন। এ ধরনের বস্তুকে মূলত Transients বলা হয়। কিন্তু ১ মিনিট ধরে এত বেশি পরিমাণ শক্তি নির্গমন অনেকটা অসম্ভব বিজ্ঞানীদের কাছে।

এটি আবিষ্কার করেছেন অস্ট্রেলিয়ার Curtin University-এর (The International Centre for Radio Astronomy Research) একদল শিক্ষার্থী (গবেষক)। তাদের মতে এই বস্তুটি আসলে কি, এখনো পরিষ্কার নয়। কারণ মহাকাশের কোনো বস্তুই এমন করে বলে জানা যায় নি।

তো এখন মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে এই নিউট্রন তারার শেষ পরিণতি কী? সাধারণত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন করতে করতে করতে নিউট্রন তারার স্পিন বা ঘূর্ণন ধীরে ধীরে সময়ের সাথে কমে যেতে যেতে একসময় শেষ সীমায় চলে আসে। এই সীমা অতিক্রম করলে আর পালসার দেখা যায় না। তো পালসার দেখা না গেলে তখন নিউট্রন তারা সম্পর্কে আর জানা সম্ভব হবে না। তবে সময়ের সাথে বিকিরণ করতে করতে নিউট্রন তারা ঠান্ডা হতে থাকে। এটাই এখন পর্যন্ত জানা নিউট্রন তারার শেষ পরিণতি। হয়তো খুব নিকট ভবিষ্যতে আমরা এর বিস্তারিত তথ্যও পেয়ে যাব, বিজ্ঞানের উপর এইটুকু আশা রাখাই যায়।

চিত্র | অত্যন্ত অধিক ভরবিশিষ্ট কোনো নক্ষত্রের সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর তা একটি নিউট্রন নক্ষত্রে পরিণত হতে পারে। © ক্যালসিডা, ইউরোপিয়ান



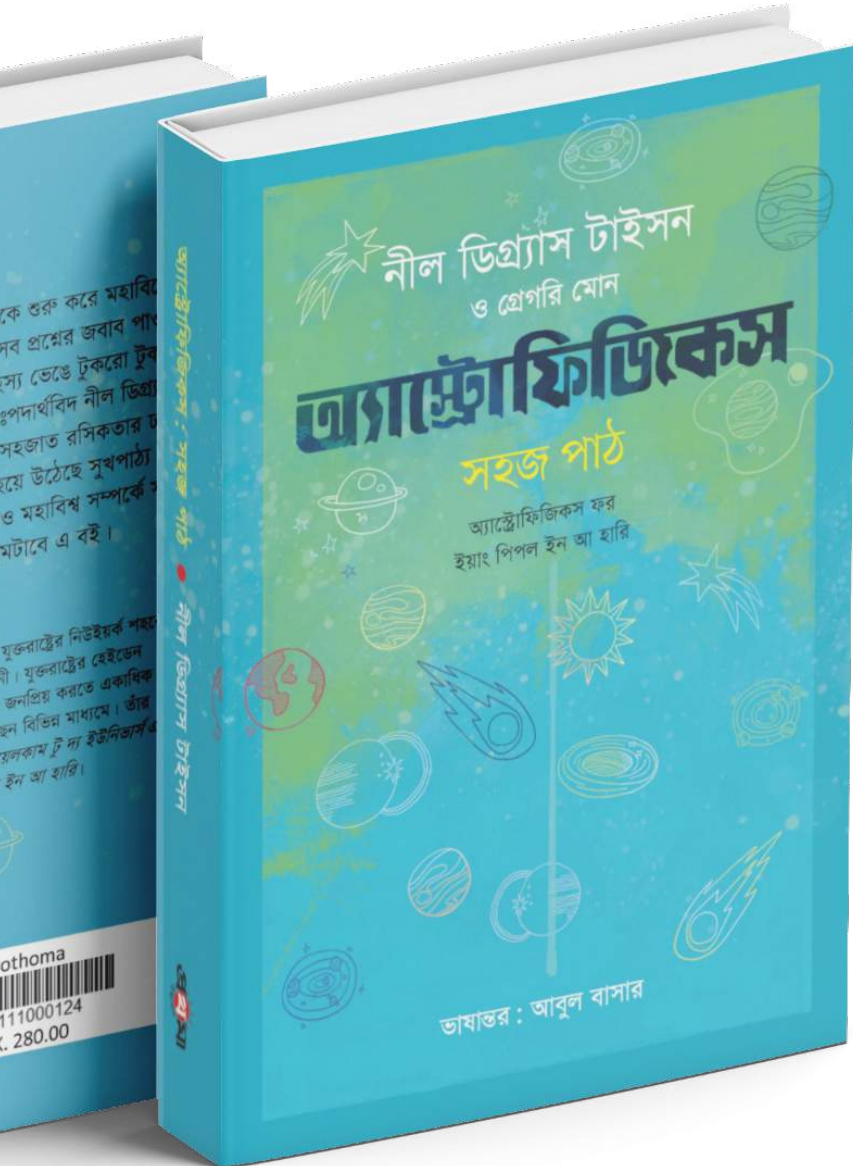
অ্যাস্ট্রোফিজিক্স

ফর ইয়াং পিপল ইন আ হারি

মুর্বনা আক্তার

বইটি লিখেছেন নীল ডিগ্রাস টাইসন ও
গ্রেগরি মোন এবং ভাষান্তর করেছেন
আবুল বাসার।

ব্যক্তিগত রেটিং : ৪/৫
মুদ্রিত মূল্য : ২৩৮ টাকা



চমক হাসান একবার বলেছিলেন,

"সত্যি আজব এই পৃথিবী নানান কিছুই খুলা,
সুন্দর ভাবে কিছুটিকে করা যায়না অথিষ্টোনা"

ঠিক তেমনি তুচ্ছ তুচ্ছ কণার সমন্বয়েই গুচ্ছ গুচ্ছ আকারে তৈরি হয়েছে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের চেনা পরিচিত জগৎ। গভীর রাতে যখন আপনি নিস্তব্ধ রাতের আকাশে হাজারো নক্ষত্রের ভিড়ে লুকিয়ে থাকা মহাজাগতিক প্রশান্তিকে অনুভব করার চেষ্টা করেন, তখন কি আপনার মনে একবারও প্রশ্ন জাগে না যে কীভাবে যাত্রা শুরু হয়েছিলো এই গ্রহ-নক্ষত্র কিংবা এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের? এর শুরু কিংবা শেষই বা কোথায়? কিইবা আছে ওপারে, যেখান থেকে ধেয়ে আসা মহাজাগতিক রশ্মি এখনো আমাদের টেলিস্কোপে পৌঁছোইনি? সত্যিই কি এলিয়েন বলে কিছু আছে? কিইবা সেই গুপ্ত বস্তুর রহস্য? আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড তৈরির সেই সরল রেসিপিটাইবা কি? আমরা কি এই ব্রহ্মাণ্ডে একা নাকি হাজারো মাল্টিভার্সের মাঝে আমরা একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র? এরকম আরো অনেক প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন আপনি এই বইটিতে। লেখক তার সহজ সরল লেখার ভঙ্গিতে এই ব্রহ্মাণ্ডের এক অপরূপ সৌন্দর্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

তিনি আরো বলেছেন, খালি চোখে রাতের আকাশে মোটামুটি ৪৫০০ তারকা দেখা যায়। আকাশ ভরা সেই ফুটকি-ফুটকি স্থির বা চলমান আলোর ব্যাখ্যা বিভিন্ন জাতি বা সভ্যতার কাছে এক এক রকম। প্রাচীন কালে অনেক জাতির কাছেই সূর্য সহ অন্যান্য তারকারা ছিলো আকাশের দেবতা। তাছাড়া প্রাচীন অনেক ধর্মের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করেছে এই গ্রহ-নক্ষত্র। অনেকের কাছে সেই সূদূর নক্ষত্রগুলো ছিলো ভাগ্যনিয়ন্তা। আর এভাবেই একসময় গড়ে উঠেছিলো জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান। পরবর্তীতে বিশ শতকে এসে আলবার্ট আইনস্টাইনের হাতে জন্ম নেয় বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতা। কেউ কেউ মনে করেন এতেই পূর্ণতা পায় জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান।

আচ্ছা! সত্যিই কী জ্যোতির্বিজ্ঞান পূর্ণতা পেয়েছে? সেকি পেরেছে প্রকৃতির সকল সত্যতা উন্মোচন করতে? এই প্রশ্ন না হয় পাঠক বন্ধুদের কাছেই রয়ে গেলো।

লেখক তার এই বইয়ে দেখিয়েছেন আমাদের সর্পিলাকার ছায়াপথের পথচলা। দেখিয়েছেন সেই বিশাল ছায়াপথে অবস্থিত পৃথিবীতেও মানুষের আগে ছিলো কতকিছুর বসবাস। তাদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে রাজত্ব করে গিয়েছে ডাইনোসরেরা। আবার পৃথিবীর বুক থেকে সেই প্রায় ১৫ কোটি বছরের রাজত্ব হটিয়ে বিদায়ও নিতে হয়েছিলো তাদের। বইটিতে লেখক সহজ সরল ভঙ্গিতে কিশোর মনে উদ্ভব হওয়া মহাকাশ সম্পর্কিত সকল প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। লেখক বইটিতে ব্যাখ্যা করেছেন বিগব্যাং এর ঠিক পরবর্তী মুহূর্তে তৈরি হওয়া কোয়ার্ক আর লেপটনের পথ চলা। এছাড়াও ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে শুরু হয়েছে রেডিও এস্ট্রোনমির যাত্রা। আচ্ছা! আপনার মনে কি কখনো প্রশ্ন এসেছে আমাদের এই সৌরজগতের প্রতিবেশী কারা কিংবা কিইবা আছে ইন্টার গ্যালাক্টিক স্পেসে? না না, আমি এগুলোর ব্যাখ্যা আজ এখানে দিবোনা। এই সকল রহস্য জানতে হলে আপনাকে অবশ্যই বইটি একবার হলেও পড়তে হবে।

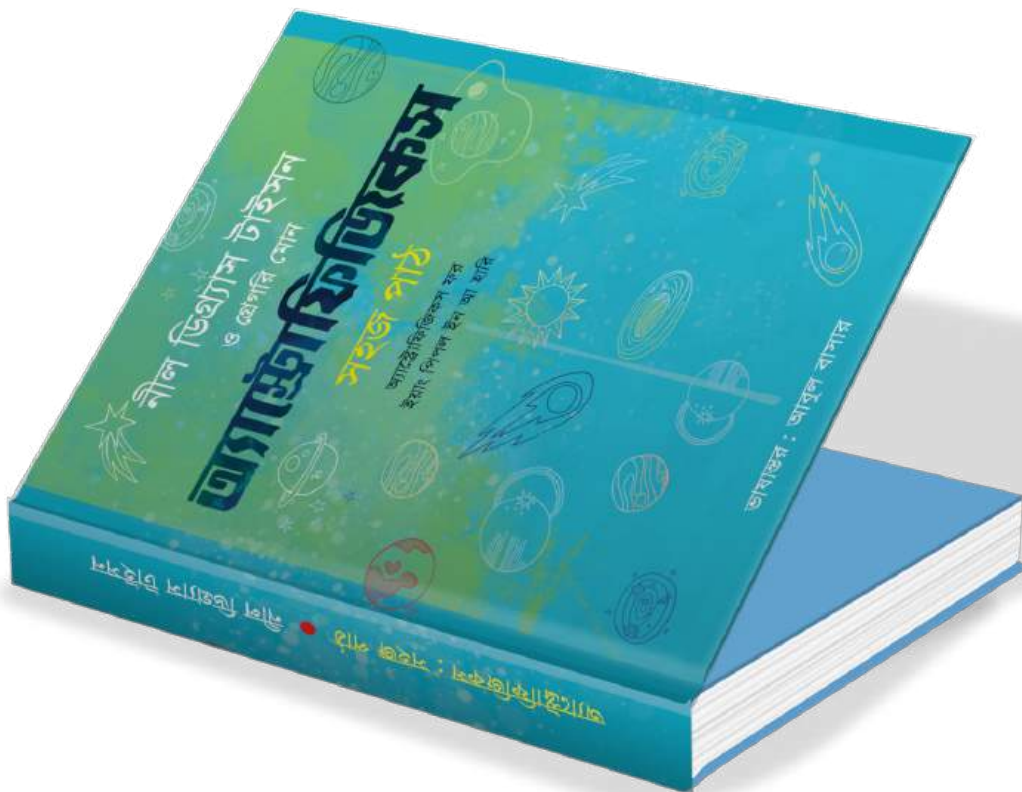
আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে এখন পর্যন্ত পাওয়া ১১৮ টি মৌলের মধ্যে অন্যতম হলো হাইড্রোজেন পরমাণু। মহা বিস্ফোরনের পরপর, গোটা মহাবিশ্বের গড়ে প্রায় ৭৩% ভরই হাইড্রোজেন পরমাণু দখল করে ছিল। আমাদের সবার পরিচিত সূর্যে, প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন টন হাইড্রোজেন পরমাণু ফিউশন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে। ফিউশনের ফলে হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে তৈরি হচ্ছে হিলিয়াম পরমানুর। যার কারণেই আমাদের সূর্য এত জ্বলজ্বল করে দিগ্বিদিকে আলো ছড়াতে পারছে। এরকম হাইড্রোজেন পরমানুর মতোই গুরুত্বপূর্ণ আরো প্রায় ১১টি মৌল নিয়ে বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যার মধ্যে কয়েকটি মৌল প্রত্যক্ষভাবেই বিগব্যাং এর সাথে জড়িত। অর্থাৎ বিগব্যাং এর ঠিক পরপরই যাদের আবির্ভাব। আমরাও চাইলে আমাদের শরীরে লুকিয়ে থাকা পরমাণু যেমন হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির খোঁজ করে করে চলে যেতে পারি নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ, এবং সেখান থেকে ঠিক বিগব্যাং এর পূর্বমুহূর্তে। প্রকৃতি তার মৌলিক স্তরেও যেনো এক অনন্য জগৎ তৈরি করে রেখেছে। আমরা কি সত্যিই কখনো পারবো প্রকৃতির সেইসকল রহস্য উন্মোচন করতে?

আচ্ছা!.."তাহলে কি আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান? না কি আমরা ধ্বংসাবশেষ?"

ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে বইটি অসাধারণ লেগেছে। তবে বইটি পড়া শুরু করার আগে কিছু বিষয় জেনে রাখা ভাল। যেমনঃ বইটি এক রাতেই পড়ে ফেলার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। কেননা বইটিতে খুব অল্প জায়গায় অনেক বেশি বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়েছে এবং লেখক ধরে নিয়েছে কণা সম্পর্কে পাঠকের প্রাথমিক ধারণা রয়েছে। যার ফলে দীর্ঘক্ষণ একসাথে পড়তে গেলে নতুনদের জন্য একটু সমস্যা হতে পারে। এখানে আমার পরামর্শ থাকবে ছোট ছোট বসায় অল্প অল্প করে পড়ার।

লেখক তার বইটিতে পূর্বকথায় লিখেছিলেন এই বইটি পড়ে একজন শিশু-কিশোরও যদি বিজ্ঞানের মোহে আকৃষ্ট হয় তাহলে তার লেখা স্বার্থক। আর আজকে এই বইটি সম্পর্কে আমার এতো কিছু লেখা ঠিক তখনই স্বার্থক হবে, যখন একজন মানুষ হলেও আমার লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে বইটি একবার হলেও পড়বে; আর মহাকাশের সৌন্দর্যকে নিজ আত্মায় ধারণ করতে পারবে।





Latin America

Aztecs, Maya and Inca Astronomy in Ancient Times

Raissa Camelo

The Incas

With a slightly different approach than the other tribes, the Incas liked to link what they observed on the sky to objects in their daily lives, such as animals, rivers and other representations. They assigned each observed object to a meaning and purpose, also grouping the stars in constellations, based on their proximity and the objects they represent. There were two types of constellations for the Incas: the “light” constellations, corresponded to “connect-the-dots” groups of stars that formed images representing objects, animals, gods and heroes of their culture. And the “dark” constellations were the dark spots on the Milky Way seen as living animals in creatures that inhabited the Milky Way “river”. Grouping the stars into constellations was one of the most important activities for the Inca, since it determined the meaning of each star, resonating in their religion and strong beliefs about the universe. One of the most remarkable details about the Inca culture is their strong belief in the connectivity of things. They believed everything in the universe was connected and that the stars and dark galaxies observed in the skies were linked to the things they represented on earth. Machu Picchu, the remaining citadel of the Inca civilization, is presumed to have been constructed to serve both as an observation site and a place for rituals and ceremonies. Today it is open for tourism and astronomical observation.

Astronomy is indeed a fascinating field of study and has existed for as long as humans have been walking on earth. Many ancient civilizations built knowledge and implemented tools and calendars based on astronomy, as well as used their observations to predict phenomena and track the weather for agriculture. The latin american tribes were no different, they had a rich culture that largely revolved around celestial objects. The influence astronomy had in their lives impacted how the study of astronomy was carried on by their descendants, even with all the damage caused by European colonisation in the early 1500s.

Figure | The Temple of the Sun at Machu Picchu was used for astronomical event observations. © DIANE COOK and LEN JENSHEL, Nat Geo Image Collection



Astronomy is said to be the oldest science of humanity. Since we started to inhabit the planet as a species, we have been observing the sky and trying to understand what celestial objects are, why they are there and how they move and interact with each other. The History of astronomy begins a long time ago, in ancient times. At first, the study of the stars was developed to obtain more accurate means of calculating dates, generating calendars and following the cycles of the seasons and harvest periods. Humanity has long been observing the influence of the sun and the phases of the year on agriculture and has sought to structure its annual calendar according to climate changes, correlated with sky observations.

Before the European conquest was brought to Latin America during the middle ages, ancient tribes inhabited the region, having their own empires, cultures, religions and methods of science. These tribes were rich in astronomy knowledge and the study of the skies made a major part of their life. From defining how they handled agriculture to the creation of festive calendars and also giving meaning to their religious beliefs. Between the many tribes that flourished in this region, three

The Mayas

Between AD 200 and AD 900, the Mayas were one of the most advanced civilizations on the planet. Back then, when they didn't have as many tools and technologies as we have, they were still able to calculate and find astronomical properties that are very close to what we can measure today. For example, the Mayans calculated that Venus passes the Earth every 583.935 days and that the lunar cycle lasts 29.53086 days. This is astonishingly close to the more accurate numbers we have today (around 583.920 days for Venus and 29.54059 days for the lunar cycle). Unfortunately, most of the documents that explain how the Mayas achieved their calculations were destroyed during the Spanish conquest. Temples and libraries were completely burned down during the colonisation process of South America and the knowledge of how the Mayas managed to attain those results without using lenses or other instruments are forever lost. Perhaps their tools were also destroyed during the Spanish invasion and we will never know.

Figure | The Mayas made major discoveries in astronomy including informations about the Venus and the moon.
© University of California, Santa Barbara



The Aztecs

The Aztecs, as many other early human civilizations, associated astronomy with religion and beliefs. They had their own calendar of 365 days, already based on the earth's translation around the sun. Their calendar was very complex and tried to embrace astronomical phenomena as a play of different deities that would determine the fate of humankind, with the sun always being portrayed at the centre of the universe in their representations.

All their rituals were based on astronomical observations and even the location of their cities and the structure of their building were planned according to their findings and interpretations of the sky. One of the most surprising aspects of Aztec culture was their destructive take on astronomy. They considered the study of the sky as a way to predict the imminent destruction of the world. Based on a cycle of 52 years, at the end of each cycle the world collapses, re-borning again with a new sun. They believed that every cycle a god sacrificed himself to be transformed into the sun, saving humanity. Therefore, human sacrifice was expected in return to please the sun-god.

Figure | The Aztecs believed that the world gets destroyed based on a 52 year cycle and hence they invented a Sun's movement based calendar. © K M Shariat Ullah, Ideogram





মোহাম্মদ নাহিদ আদনান
গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

একদিন দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী পার্কে বসে কথা বলছেন।

১ম বিজ্ঞানী : আচ্ছা ভাই আপনি কি বিশ্বাস করেন যে পৃথিবী এবং সূর্য গোল?

২য় বিজ্ঞানী : এটা আবার কী ধরনের প্রশ্ন? বিশ্বাস করব না কেন?

১ম বিজ্ঞানী : আচ্ছা, তাহলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?

২য় বিজ্ঞানী : জি, অবশ্যই।

১ম বিজ্ঞানী : পৃথিবী এবং সূর্য যদি সমতল হত তাহলে কী হত?

২য় বিজ্ঞানী : তেমন কিছু না, ফেসবুকে আরেকটা গ্রুপ খোলা হত আরকি "Flat Sun Society" নামে!

জানতে
ক্ষমতা নেই



মহাবিশ্বের প্রায় ৭০% কী উপাদানে তৈরি?
উত্তর - ডার্ক এনার্জি



কোন নক্ষত্র পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি
অবস্থিত? উত্তর - প্রক্সিমা সেন্টাউরি



গ্যালিলিও তার টেলিস্কোপ দিয়ে বৃহস্পতি গ্রহের
কয়টি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন? উত্তর -
৪টি। ইউরোপা, গ্যানিমেড, ক্যাপলিস্টো, আইও



মহাবিশ্বের বয়স নির্ধারণের জন্য কোন কণার
বিকিরণ বিশ্লেষণ করা হয়? উত্তর - কসমিক
মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড



অরিয়ন নীহারিকা (Orion Nebula) কোন
ধরনের নীহারিকা? উত্তর - নির্গমন নিহারিকা



স্টারশিপ রকেটের জন্য ব্যবহৃত ইঞ্জিনের
নাম কী? উত্তর - র্যাপটর



অরোরা তৈরির প্রধান কারণ কী? উত্তর -
সূর্যের চৌম্বক ঝড়



প্রথম ছবি তোলা ব্ল্যাকহোলের নাম কী?
উত্তর - মেসিয়ার ৮৭ (M87)



একটি নিঃসঙ্গ গ্রহকে চিহ্নিত করার জন্য
কোন উপায় সবচেয়ে কার্যকর?
উত্তর : মাইক্রোলেসিং পদ্ধতি



অ্যানি জাম্প ক্যানন কোন ধরনের তারার
শ্রেণিবিন্যাস সিস্টেম তৈরি করেছিলেন?
উত্তর - হার্ভার্ড শ্রেণিবিন্যাস (OBAFGKM)।



চিত্র | সাম্প্রতিক দাবানলে পুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া লস অ্যাঞ্জেলেসকে কল্পনা করা হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে। © কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ, চ্যাটজিপিটি

আমরা যদি আমাদের আশেপাশে তাকাই তবে লক্ষ্য করব পরিবেশের কিছু কিছু বিষয় প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হয় যেমন: পরিবেশের তাপমাত্রা, চাপ, উষ্ণতা ইত্যাদি। এই পরিবর্তন খুবই ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে হয়। এর পরিমাপকে বলে আবহাওয়া। কয়েক যুগের আবহাওয়ার সমষ্টিকে বলা হয় জলবায়ু। যেমন বাংলাদেশের ঢাকায় আজ ১৮০ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে কাল কোনো বৃষ্টিই হয়নি। বরং আকাশ রোদে ঝলমল করছিল। এই পরিমাপ হচ্ছে আবহাওয়া। অন্যদিকে বাংলাদেশের জলবায়ু হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ। অনেক বছরের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করেই এ সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। জলবায়ু সহজে পরিবর্তন হয় না। আচ্ছা, যদি জলবায়ু পরিবর্তন হয় তবে কি কোনো সমস্যা আছে? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ! সমস্যা আছে।

কতটুকু ক্ষতিকর জলবায়ু পরিবর্তন

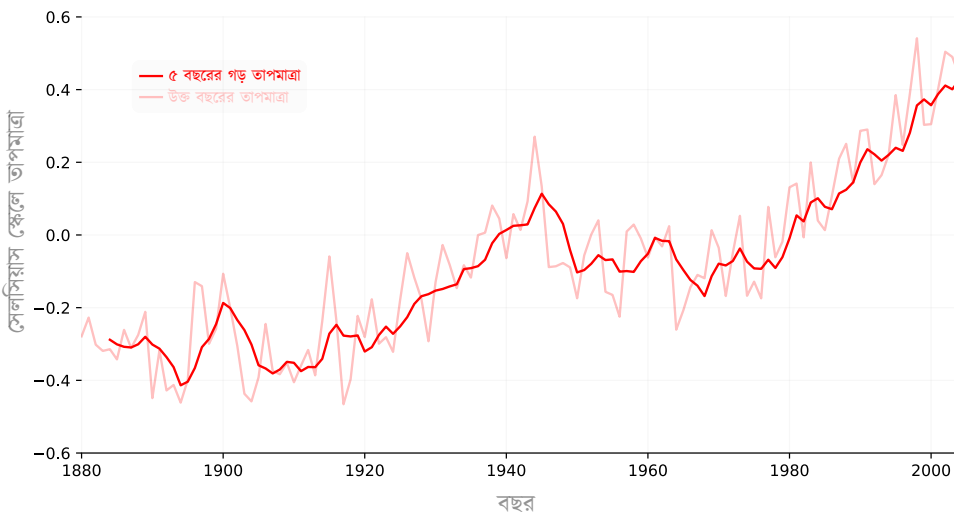
কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি

জলবায়ু পরিবর্তনের একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে অবোধে গাছ কাটা এবং শিল্পকারখানার বর্জ্য ও ধোঁয়া। মূলত পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই জলবায়ু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছিল। কিন্তু ১৮ শতকের শেষের দিকে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। এর ফলে শিল্পকারখানার পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে ও যন্ত্রপাতি থেকে নির্গত ধোঁয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ধোঁয়ার একটি বিশাল অংশই ছিল কার্বন ডাই অক্সাইড। দেখা গিয়েছে শুধু শিল্প বিপ্লবের ফলেই জলবায়ু পরিবর্তনের হার প্রায় ১৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে সকলে নিজেদের বাড়িঘর নির্মাণে ও অনান্য আসবাবপত্র নির্মাণে কার্টের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে। নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে সেই কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে সাম্যতায় আনবে সে সুযোগটিও পরিবেশের হয়ে উঠেনি। ফলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কিছুদিনের মধ্যেই আকাশ ছুতে থাকে।

বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি

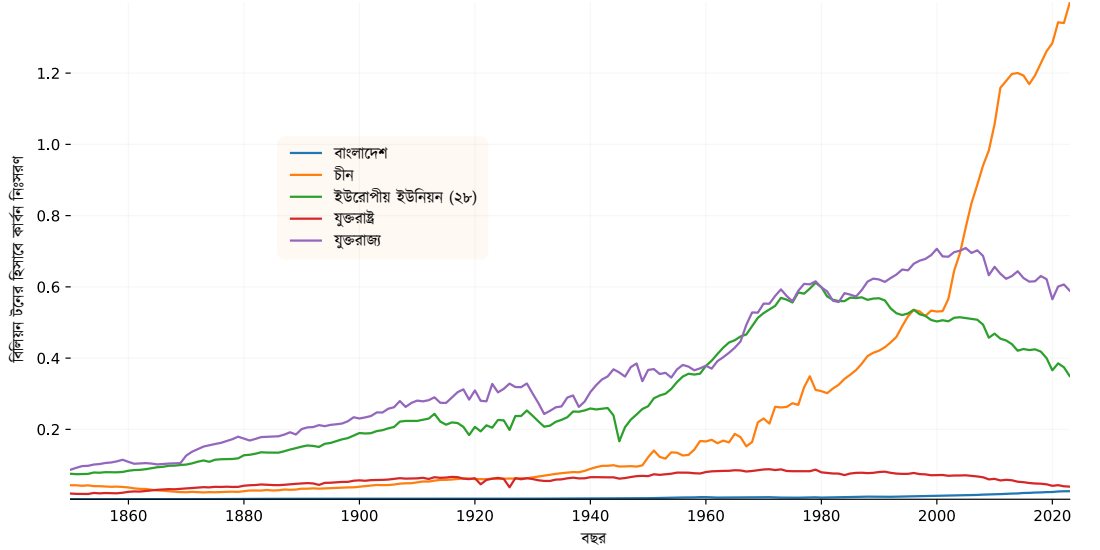
কার্বন ডাই অক্সাইডের একটি বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। এটি তাপ ধারণ করে রাখতে পারে। এরকম আরো কিছু গ্যাস রয়েছে যারা তাপ ধারণ করে রাখতে সক্ষম যেমনঃ মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন ইত্যাদি। এ ধরনের গ্যাসকে গ্রিনহাউজ গ্যাস বলে। সূর্য থেকে তাপ আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করলে এসকল গ্রিনহাউজ গ্যাস সেই তাপ ধরে রাখে, ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ ধীরে ধীরে উষ্ণ হতে থাকে। শিল্প বিপ্লবের ফলে গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানেও পাচ্ছে। ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। নাসাসহ আরো কয়েকটি গবেষণা সংস্থার দেওয়া তথ্য মতে শুধু গত ৫০ বছরে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমাদের কারো কারো মনে হতে পারে, তাপমাত্রা খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সমস্যা হবে না। তাহলে জেনে রাখো আইপিসিসির (Intergovernmental Panel on Climate Change) দেওয়া তথ্যানুসারে, এখন যেভাবে চলছে সব যদি এভাবেই চলে তবে আগামী শতকের মধ্যে প্রায় ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটবে যার ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের মত নানা নিম্নভূমির অঞ্চল সাগরের অতলে তলিয়ে যাবে।



চিত্র | ১৮৮০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ক্রমবর্ধমান। গত ২৫ বছরেই তাপমাত্রা প্রায় ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। উপাত্ত - আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইন ডাটা

খড়া ও বন্যা

বৈশ্বিক তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে খড়া দেখা দিবে। শস্য উৎপাদনের ভূমি হারিয়ে যাবে। উর্বর জমি অনুর্বর হয়ে যাবে। ফলে সারা পৃথিবীতে দেখা দিবে খাদ্য সংকট। একদিকে যেমন খড়ার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে, অন্যদিকে পাওয়া যাচ্ছে বন্যার পূর্বাভাস। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলের বরফ ও গ্লেসিয়ার গলন শুরু হয়েছে। এই গলিত বরফের ফলে সমুদ্রের উচ্চতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উইকিপিডিয়ায় প্রদত্ত তথ্যমতে গত 25 বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় 100 মিলিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতি বছর প্রায় 3.3 মিলিমিটার করে এ উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে চললে বাংলাদেশের মতো নিম্নভূমির অঞ্চলগুলো তলিয়ে যাবে ও অনেক অঞ্চলে বন্যা দেখা দিবে। মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার ফলে মেরু ভাষ্কর্য সহ নানা প্রাণী বিলুপ্তির পথে চলে এসেছে। এছাড়াও জলবায়ুর এ তড়িৎ পরিবর্তনের ফলে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- ঘূর্ণিঝড়, বনে আগুন, অগ্ন্যুপাত ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখন পূর্ব থেকেও শক্তিশালী হয়ে হানা দেয়। এসকলের বাস্তবতা 1987 সালের বাংলাদেশে হয়ে যাওয়া বন্যা, 2019 সালে অস্ট্রেলিয়ার বনে লাগা আগুন কিংবা 2005 সালের হারিকেন ক্যাটরিনার চালানো ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করলেই বুঝা যায়।



চিত্র | মূলত শিল্পবিপ্লবের পরই কার্বন ডাই অক্সাইডের নিঃসরণের পরিমাণ তড়িৎ গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উপাত্ত - আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইন ডাটা

এল নিনো

এল নিনো (El Niño) হলো হটাৎ করেই নদী বা সমুদ্রের কিছু অঞ্চলের পানি উষ্ণ ভাব ধারণ করার ঘটনা। 1924 সালে পেরু অঞ্চলের কিছু জেলের সাথে Gilbert Walker নামের এক বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। এর ফলে বন্যা, খড়া, মাছের নানা রোগ ও ঐ অঞ্চলের আশেপাশের মানুষের নানা রোগ হয়।

কোরাল হতে শৈবালের মুক্ত হওয়া

সাধারণত কোরালের উপরেই শৈবাল আশ্রয় নেয়। পৃথিবীর প্রায় 70% অক্সিজেন এসকল শৈবালই উৎপাদন করে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে কোরালের উপরে থাকা এসকল শৈবাল মুক্ত হয়ে যায়। মুক্তবস্থায় আশ্রয় থাকে না বলে সেসকল শৈবাল আর জীবিত থাকতে পারে না। ফলে শৈবালের ঘাটতি দেখা দেয় ও অক্সিজেন উৎপাদনের হার হ্রাস পায়। এছাড়াও এর ফলে কোরালের সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

এসকল বিষয়বস্তু ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আরো জানা অজানা অনেক সমস্যাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে নিকট ভবিষ্যতে। প্রায় 2.4 মিলিয়ন বছর আগে জলবায়ুর বিশাল একটি পরিবর্তন ঘটে যা Ice Age নামে পরিচিত। জলবায়ুর এ বিশাল পরিবর্তনের ফলেই কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ম্যামথের মত বিশালদেহী অনেক প্রাণী। আমরা যদি জলবায়ুর পরিবর্তনকে ধীর করতে না পারি তবে আমাদেরও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার একটি বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।

তোমরা জেনে অবাক হবে যে কেউ কেউ মানবজাতির এ সংকটকালেও জলবায়ু পরিবর্তনের এ বিষয়টিকে মিথ্যা মনে করে। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গিয়েছে 38 শতাংশ মার্কিন নাগরিক জলবায়ু পরিবর্তনের এ বিষয়টিকে মানতে নারাজ। তাদের যুক্তি কোথায়?

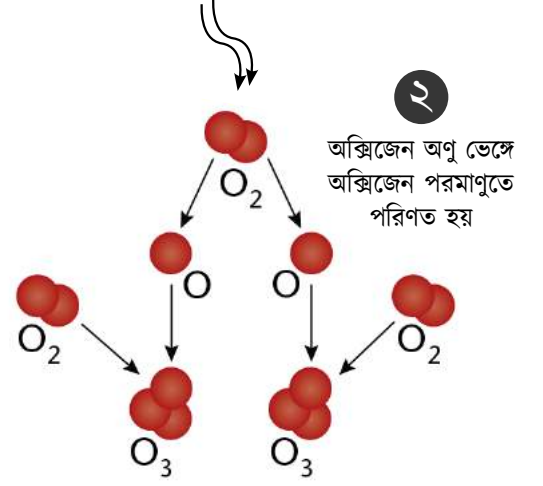
পৃথিবীর জলবায়ু তো পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকেই বেড়ে চলছিলো। এখনো যদি বাড়ে তবে তা তো স্বাভাবিক। এতে এতো চিন্তার কি আছে?

চিন্তার আছে অনেক কিছু। স্বাভাবিকভাবে যতটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছিলো, শিল্প বিপ্লবের পর তা বিদ্যুৎ গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে যে গ্লেশিয়ার আগামী ৫০০ বছরে গলার কথা না, তা আগামী ৫ বছরের মধ্যেই গলে যাচ্ছে।

গাছেরও তো কার্বন ডাই অক্সাইড দরকার। জলাবায়ু পরিবর্তন যদি নাই হতে দেওয়া হয় তবে গাছ তার প্রয়োজনীয় কার্বন ডাই অক্সাইড পাবে কোথা থেকে?

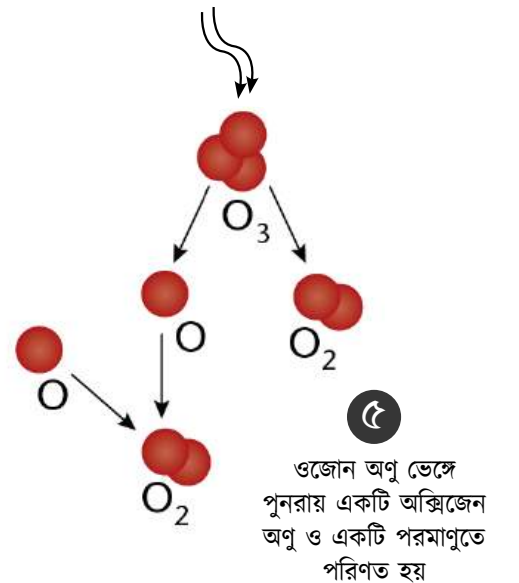
গাছের যতটুকু কার্বন ডাই অক্সাইড প্রয়োজন তার থেকে কয়েকগুণ বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড বর্তমানের বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান। ফলে অতিরিক্ত হিসেবে যতটুকু কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবেশে থেকে যাবে তা পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়াবে ও আমাদের জন্য বয়ে আনবে নানা রোগ-অসুখ। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, বর্তমানে যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড রয়েছে, বিগত ৮ লক্ষ বছরেও এতো বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল না।

১
240 ন্যানোমিটার থেকে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনি রশ্মি একটি অক্সিজেন অণুকে আঘাত করে



৩
ঐ অক্সিজেন পরমাণু পাশে থাকা অক্সিজেন অণুর সাথে ক্রিয়া করে ওজোনে পরিণত হয়

৪
240 ন্যানোমিটার থেকে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনি রশ্মি একটি ওজোন অণুকে আঘাত করে



এখনো অনেক দেড়ি আছে। জলবায়ু পরিবর্তন
কমিয়ে আনতে পরে কাজ করা যাবে।



কয়েক বছর আগে, জলবায়ু ও আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের কয়েকটি দল পৃথিবীবাসীদের সতর্কবার্তা দিয়েছেন এ ব্যাপারে। তারা জানিয়েছেন, আমাদের কাছে আর 12 বছর আছে জলবায়ুর এ পরিবর্তন রোধ করতে। এর পর পদক্ষেপ নিলেও এ পরিবর্তন পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হয়ে যাবে।

তাহলে জলবায়ুর এ পরিবর্তনকে কমিয়ে আনতে
কী কী করতে হবে?



প্রাকৃতিক জ্বালানির উপর নির্ভর করে এমন সকল শক্তির উৎস থেকে সরে আসতে হবে। এর বদলে নবায়নযোগ্য নানা শক্তির উৎস যেমন: সূর্যালোক শক্তি, বাতাসের গতিশক্তি ইত্যাদির ব্যবহার ও পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়তে হবে। শুধু ব্যক্তিগতভাবে এটি করলে হবে না, তোমার কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানেও এর ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

Incandescent লাইট বাল্বের ফলে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুতশক্তি অপচয় হয়। এর বদলে LED বাল্ব ব্যবহার করতে হবে। এটি একদিকে যেমন বিদ্যুতশক্তির অপচয় কমায়, অন্যদিকে অধিক টেকসই।

যেসকল শক্তির ব্যবহারের ফলে নানা গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গত হয়, তার ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে ও যত দ্রুত সম্ভব তার বিকল্প খুঁজে বের করতে হবে।

এসি, রেফ্রিজারেটর সহ আরো কয়েকটি যন্ত্র থেকে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গত হয়। এর ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে।

অধিক পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে ও নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বৃক্ষের গুরুত্ব সাধারণ জনগণকে বুঝাতে হবে।

যথাসম্ভব জিনিসপত্রের পুনঃব্যবহার (Recycle) করতে হবে। রাস্তার প্রায় প্রতিটি মোড়ে দুইটি ডাস্টবিন থাকা উচিত যার মধ্যে একটি হবে পুনঃব্যবহার করা যায় না এমন বস্তুর জন্য ও আরেকটি হবে পুনঃব্যবহার করা যায় এমন বস্তুর জন্য।

কাঠের তৈরি আসবাবপত্র ব্যবহার করা কমিয়ে দিন। এর বদলে অন্য কিছু দিয়ে তৈরি আসবাবপত্র ব্যবহার করুন। প্লাস্টিকের পণ্য ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন।

পানির অপচয় রোধ করুন ও পানি দূষণ বন্ধ করুন। একই সাথে বায়ু দূষণও বন্ধ করতে হবে।

নতুন ঘর বাড়ি তৈরি করবেন না। বরং যা বর্তমানে আছে তা পুনর্নির্মাণ করুন। এতে অনেক আবাদি জমি বেচে যাবে, যার সাহায্যে একদিকে যেমন শস্যের যোগান দেওয়া সম্ভব অন্যদিকে অক্সিজেনের পরিমাণও বৃদ্ধি করা সম্ভব।

প্রাইভেট গাড়ির ব্যবহার কমিয়ে গণপরিবহন ব্যবহার করুন। সম্ভব হলে সাইকেল বা পায়ে হেটে যাতায়াত করুন।

কার্বন ট্যাক্সের প্রচলন ঘটাতে শুরু করুন। নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি কারো ব্যবহৃত কোনো যন্ত্র থেকে কার্বন বা তার সাথে সামঞ্জস্য আছে এমন কোনো পদার্থ নির্গত হলে, অতিরিক্ত পরিমাণের উপর কর প্রদান বাধ্যতামূলক করা জরুরি হয়ে দাড়িয়েছে।

সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টিতে কাজ করতে হবে তা হলো, মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া।

গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি শতাব্দীর শেষ নাগাদ বৈশ্বিক খাদ্য উৎপাদন অঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ ঝুঁকিতে পড়বে বলে জানানো হয়েছে আলতো ইউনিভার্সিটির গবেষকদের এক সাম্প্রতিক গবেষণায়। গ্রিন হাউজ গ্যাসের ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও খাদ্য শস্য উৎপাদনে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। অনেক এলাকায় ব্যাপক আকারে পানি স্বল্পতা দেখা দিয়েছে।

[ক্লাইমেট ডট নাসা ও ন্যাশনাল ওশেনিক এন্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর সূত্রে লেখা]

মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য!

তোকির আহমেদ

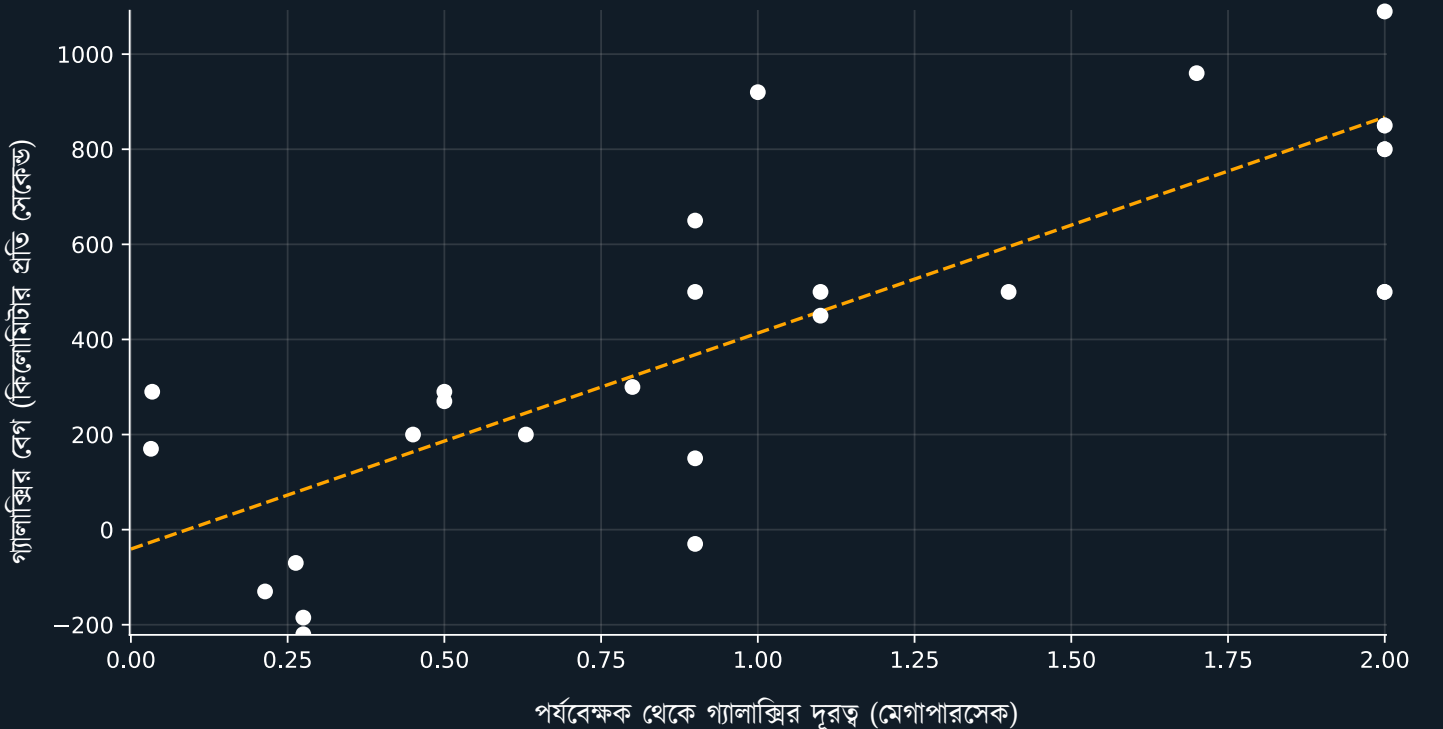
মহাবিশ্ব! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা ইউনিভার্স! যেই নামেই ডাকা হোক না কেন সব নামগুলোর মাঝেই অসীম বিস্তৃতির আঁচ পাওয়া যায়। এই বিস্তৃতির সাথে সাথে মানব মনে তা এক অপরিসীম কৌতুহলেরও জন্ম দেয়। রাতের আকাশের চমৎকারিত্ব ও রহস্য আদিকাল থেকেই মানুষকে বিস্মিত ও আকৃষ্ট করেছে। জোনাকির মতো জ্বলতে থাকা নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞানীরা শুধু মুগ্ধই হননি, আকাশে দৃশ্যমান বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তু (celestial objects) সম্পর্কে জানার জন্য আশ্রয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা তাই সবসময় পরিবর্তিত হচ্ছে। মহাবিশ্বের সৃষ্টি, মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তু যেমন- গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, গ্যালাক্সি ইত্যাদি এবং বিভিন্ন ঘটনা মানুষের মনে এখনও বিস্ময় সৃষ্টি করে।

এই ইউনিভার্স বা মহাবিশ্ব আসলে কী? তা আসলে ঠিক কতটা বড়ো? আর সময়ের সাথে সাথে যদি মহাবিশ্ব প্রসারিতই হতে থাকে তবে সময় পিছিয়ে গেল তা ঠিক কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে? যদি এই দুনিয়ার সকল বস্তুই পরমাণু দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে পরমাণু বা অ্যাটম সৃষ্টি হলো কীভাবে? আর সময়ের গতি যদি সবসময় একমুখী হয়ে থাকে তবে তার সূচনা হলো কবে? তার আগে কী ছিল? মহাবিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন শব্দ কোনটি? এখন যদি সে শব্দ আমরা শুনতে পাই তবে কেমন অনুভূত হবে? আজকে আমরা পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করব সময়ের সবচেয়ে দীর্ঘ এই যাত্রার। উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব সাড়া জাগানো এই প্রশ্নগুলোর।

চারপাশের সকল বস্তুর উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে অনেকটা পিছিয়ে পৌঁছে যেতে হবে ঠিক সেই সময়টায় যখন সময়েরই কোনো অস্তিত্ব ছিল না। যার পরমুহুর্তেই শুরু হয়েছিল এই মহা সৃষ্টিজগতের। পাড়ি দিতে হবে প্রায় ১৩.৭৯৯০২১ বিলিয়ন বছর। এটা সেই সময় যেই সময়ে কিছুই ছিল না। কিছু না! না ছিল কোনো স্থান, না ছিল কোনো সময় আর না ছিল কোনো আলো! কিন্তু তার পরই হঠাৎ “কোনো এক সময়, কোনো এক কারণে” একটা ছোট্ট আলোর বিন্দু ধপ করে জ্বলে উঠলো। অত্যন্ত উত্তপ্ত সেই আলোক বিন্দুটার মধ্যের নিহিত ছিল এই মহাবিশ্বের যাবতীয় রসদ। সমগ্র স্থান আর সকল বস্তু। সেই থেকেইটিক টিক করে উঠল কসমিক ক্লক! ছুটতে শুরু করল সময়। আর স্থান শুরু করল তার মহাজাগতিক প্রসারণ। আর আক্ষরিক অর্থে এটাই ছিল সময়ের শুরু এবং সমস্ত কিছুর সূচনা।

ভাবা যায় এই বিশাল পরিব্যাপ্ত মহাবিশ্ব এক সময় একটি পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র অবস্থায় ছিল? আশ্চর্যজনক, তাই না? তবে হ্যাঁ, এই আশ্চর্যজনক বিষয়টা আমাদের সামনে এসেছে অনেক পরে। আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড. এডউইন পাওয়েল হাবলের সৌজন্যে। তার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি আমাদের চারপাশে থাকা অন্যান্য সকল গ্যালাক্সি বা ছায়াপথগুলো সময়ের সাথে সাথে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু মুখ ফসকে বলে দিলেই তো হয় না যে আমাদের মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিসমূহ একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বা মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটছে! তার পিছনে উপযুক্ত প্রমাণ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি তো থাকতে হবে, তাই না? মহাবিশ্ব প্রসারণের সেই যুক্তিটাই দেখিয়েছিলেন ড. এডউইন পাওয়েল হাবল!

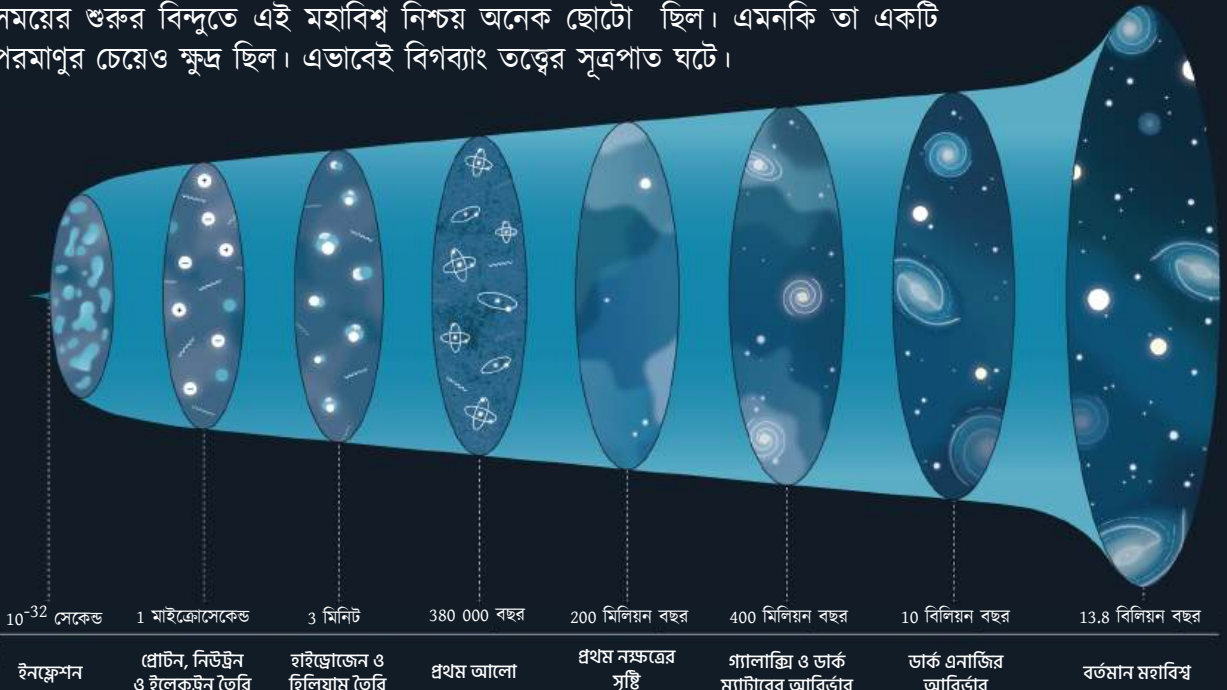
চিত্র। বিজ্ঞানী হাবল পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পান, যে গ্যালাক্সি আমাদের থেকে যত দূরে আছে, সে গ্যালাক্সি তত দ্রুত আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, উপাত্ত - হাবল (১৯২৯)



জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাবল যেই পদ্ধতিতে আমাদের মহাবিশ্বের প্রসারণ লক্ষ্য করেছিলেন, সেই পদ্ধতিটিকে বলা হয় ডপলার শিফট। আমরা জানি আলো এক ধরনের তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ। এই তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে আমরা বিভিন্ন রঙের আলো দেখতে পাই। দৃশ্যমান অঞ্চলের সবচেয়ে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোটাকে আমরা লাল রঙের দেখি আর সবচেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকে নীল রঙের দেখি। (যদিও বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সব থেকে কম তারপরও আমাদের চোখ বেগুনি রঙের তুলনায় নীল আলোর প্রতি একটু বেশিই সংবেদনশীল।) আর সাদা আলো হচ্ছে আমাদের দৃশ্যমান সবগুলো আলোর মিশ্রণে তৈরি এক যৌগিক আলো। আমাদের সাপেক্ষে কোনো আলোক উৎস যদি গতিশীল থাকে তাহলে আমাদের কাছে মনে হবে ঐ উৎস থেকে আগত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এটাকেই বলা হয় ডপলার শিফট। কোনো একটা উৎসের আলো যেই রঙেরই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের চোখে যেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যটা এসে পৌঁছাবে, আমরা উৎসটাকে সেই রঙেরই দেখতে পাব। আলোক উৎসটি যদি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তাহলে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য কিছুটা বেড়ে যাবে। ফলে আমাদের কাছে উৎসটি থেকে আসা আলোকে লাল রঙের বলে মনে হবে। এটাকে বলা হয় রেড শিফট। আবার যদি আলোক উৎসটি আমাদের কাছে আসতে থাকে তাহলে তার তরঙ্গ সংকুচিত হয়ে যাবে। ফলে আমাদের কাছে উৎসটি থেকে আসা আলো নীল রঙের বলে মনে হবে আর এটাকেই বলা হয় ব্লু শিফট। এভাবে কোনো একটা উৎস থেকে আসা আলো বিশ্লেষণ করে আমরা তার গতিবেগ এবং সেটি কোনদিকে ছুটে চলছে সেটিও বের করে ফেলতে পারি। এতক্ষণ আমরা ডপলার শিফট সম্পর্কে জানলাম। এবার হাবল স্যারের কাছে আবার ফিরে যাওয়া যাক।

আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল আমাদের মহাকাশের গ্যালাক্সি গুলোর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তার টেলিস্কোপ দিয়ে একটি একটি করে গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ করেন। গ্যালাক্সিগুলো থেকে আসা আলোকে বিশ্লেষণ করে তিনি সেগুলোর গতিবেগ বের করতে লাগলেন। আমরা আগেই জানলাম কোনো উৎস থেকে আসা আলোর বর্ণালি বিশ্লেষণ করে আমরা উৎসের গতিবেগ বের করে ফেলতে পারি। এভাবেই হাবল দেখলেন একটি গ্যালাক্সি যত বেশি দূরে সেটি তত বেশি বেগে ছুটে দূরে সরে যাচ্ছে। আর তারা যতই দূরে সরছে ততই তাদের বেগ ও বৃদ্ধি পাচ্ছে (আসলে গ্যালাক্সিগুলো দূরে সরে যাচ্ছে না, গ্যালাক্সি ও আমাদের মাঝের যে জায়গাটি আছে সেই জায়গাটি প্রসারিত হচ্ছে)। সেই থেকেই বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন আমাদের এই ইউনিভার্স ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। এই ধারণা থেকেই নতুন চিন্তার উদ্ভব ঘটে। যদি ইউনিভার্স সময়ের সাথে সাথে প্রসারিতই হতে থাকে, তবে সময়কে পিছিয়ে অতীতে যেতে থাকলে নিশ্চয় মহাবিশ্বের বিস্তৃতি বর্তমানের তুলনায় কম ছিল। এভাবে সময়ের গুরুতর বিন্দুতে এই মহাবিশ্ব নিশ্চয় অনেক ছোটো ছিল। এমনকি তা একটি পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র ছিল। এভাবেই বিগব্যাং তত্ত্বের সূত্রপাত ঘটে।

চিত্র। মহাবিশ্ব একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো আকারে ছিল যা ইনফ্লেশন হয়ে বর্তমান সুবিশাল আকৃতিতে এসেছে।
© নাসা থেকে ভাষান্তর



অনেকে মনে করে থাকেন বিগব্যাং তত্ত্ব মহাবিশ্বের সূচনাকে ব্যাখ্যা করে। আসলে বিষয়টি এমন নয়। থিওরেটিক্যাল অ্যাস্ট্রো ফিজিসিস্ট ডেভিড ন্যাথেনিয়েল স্পার্গেল বলেছেন -

The Big Bang Theory is not really a theory of how the universe began. It's really a theory of how the universe evolved

অর্থাৎ বিগব্যাং তত্ত্ব মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনা ব্যাখ্যা করে না, বরঞ্চ এই মহাবিশ্বের উদ্ভব ও বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেয়। মহাবিশ্ব সৃষ্টির সঠিক মুহূর্ত সম্পর্কে জানা যায়নি। কিন্তু মহাবিশ্বের বয়স যখন 10^{-43} সেকেন্ড, সেই সময়টার কথা আমরা জানি। তার আগের মুহূর্ত এখনও আমাদের কাছে রহস্য। তবে এই সময়টা এতই অল্প যে যা আমরা অনুভবই করতে পারি না। তবুও এই সময়টা একেবারে শূন্য না।

প্রচণ্ড উত্তপ্ত এই ইউনিভার্স তখন যে-কোনো ছোট শিশুর মতোই অত্যন্ত চঞ্চল, অত্যন্ত ছটফটে এবং ভীষণ রকমের অস্থিতিশীল ছিল। আর সেই সঙ্গে তার প্রসারণ হারও প্রচণ্ড রকমের বেশি ছিল। এই হার এটাই বেশি ছিল যে তা আলোর বেগের তুলনায় ও অনেক অনেক গুণ দ্রুত ছিল। আমাদের মহাবিশ্ব জন্ম হবার পর আনুমানিক 10^{-30} সেকেন্ড পর্যন্ত এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে আর সেটি হলো এক অবিশ্বাস্য প্রসারণ যাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ইনফ্ল্যাশন। ইনফ্ল্যাশনের এই প্রসারণটি ছিল অবিশ্বাস্য থেকেও অবিশ্বাস্য রকমের। এই প্রসারণের গতি ছিলো আলোর গতির থেকেও বেশি। এই অবিশ্বাস্য থেকেও অবিশ্বাস্য প্রসারণে অর্থাৎ মহাবিশ্ব সৃষ্টির 10^{-30} সেকেন্ড বা এক সেকেন্ডের বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সময়ে মহাবিশ্বের আকার 10^{60} গুণ বা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন গুণ বেড়ে গেলো! এই অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় প্রসারণের পর মহাবিশ্বের আকার কতটুকু হলো কল্পনা করতে পারব কী আমরা? তার আকার হলো একটা কমলার মতো, অর্থাৎ মহাবিশ্বের এত অকল্পনীয় প্রসারণের পরও তার যেই আকৃতি দাড়ালো সেটা অনায়েসেই আমাদের হাতের মুঠোয় এটে যাবে। এবার ভাবুন তাহলে ঐ বিন্দুটা কতটা ছোটো ছিল!

এসময় সবল নিউক্লীয় বল আলাদা হয়ে গিয়ে প্রভাব বিস্তার করে। মহাবিশ্বের বয়স যখন 10^{-12} সেকেন্ড, তখন তাপমাত্রা নেমে আসে 10^{15} কেলভিনে। এ সময় তড়িৎচুম্বক বল আলাদা হয়ে যায়। আর তড়িৎচুম্বক বল আলাদা হয়ে যাওয়ার পর বাকি থাকে দুর্বল নিউক্লীয় বল, তার মানে তখন সেটিও আলাদা হয়ে যায়। আর, মোটামুটি এই সময় তথা মহাবিশ্বের শুরু 10^{-12} সেকেন্ড সময় পর থেকেই চারটি মৌলিক বলেই মহাজগতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে একসাথে।

এরপর, মহাবিশ্বের বয়স যখন 10^{-6} সেকেন্ড, তখন তাপমাত্রা নেমে আসে 10^{13} কেলভিনে। ঠিক এসময়ের আগ পর্যন্ত মহাজগতে বিদ্যমান কণাগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলাতে থাকে। তাই তারা পরস্পর যুক্ত হয়ে সুস্থিতভাবে প্রোটন ও নিউট্রন সৃষ্টি করতে পারেনি। প্রোটন নিউট্রন সৃষ্টি হতে থাকে এবং একইসাথে অনবরত তারা ভেঙ্গে আবার কোয়ার্কের পরিণত হতে থাকে (প্রোটন ও নিউট্রন কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত)। ঠিক এসময় পর থেকেই কোয়ার্ক সুস্থিতি লাভ করে ও আপ কোয়ার্ক ও ডাউন কোয়ার্ক যুক্ত হয়ে প্রোটন ও নিউট্রনের সৃষ্টি করতে থাকে। মহাবিশ্বের ম্যাটার বা পদার্থের সৃষ্টির প্রথম ধাপই বলা যায়।

তিনটি মৌলিক বিষয়ের ওপর বিগব্যাং প্রতিষ্ঠিত: আদিম মহাবিশ্ব ছিল প্রচণ্ড উত্তপ্ত। আদিম মহাবিশ্ব ছিল অসীম ঘনত্ব বিশিষ্ট, মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল।

বিগব্যাং যদিও মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্পর্কে বেশ ভালো, স্পষ্ট, গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু তারপরও অনেক প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব নিশ্চুপ। সেগুলো হলো:

১। অসীম ঘনত্বের সে বিন্দুটি কোথায় থেকে এল? ২। বিস্ফোরণটি কেন ঘটল? ৩। বিন্দুটিতে এমন কী শক্তি ছিল, যা এত বৃহৎ ভরকে ধরে রেখেছিল? ৪। বিস্ফোরণের আগে কী ছিল? ৫। বিস্ফোরণের পরই যদি স্থান-কালের উৎপত্তি হয়ে থাকে, তবে কণাটি কোথায় ছিল? সেটি কি কোনো স্থানে ছিল না?!

মহাকর্ষ বল

বিশ্বজগতের প্রত্যেক বস্তুই একে অপরকে আকর্ষণ করছে, একে বলে মহাকর্ষ বল।

সবল নিউক্লীয় বল

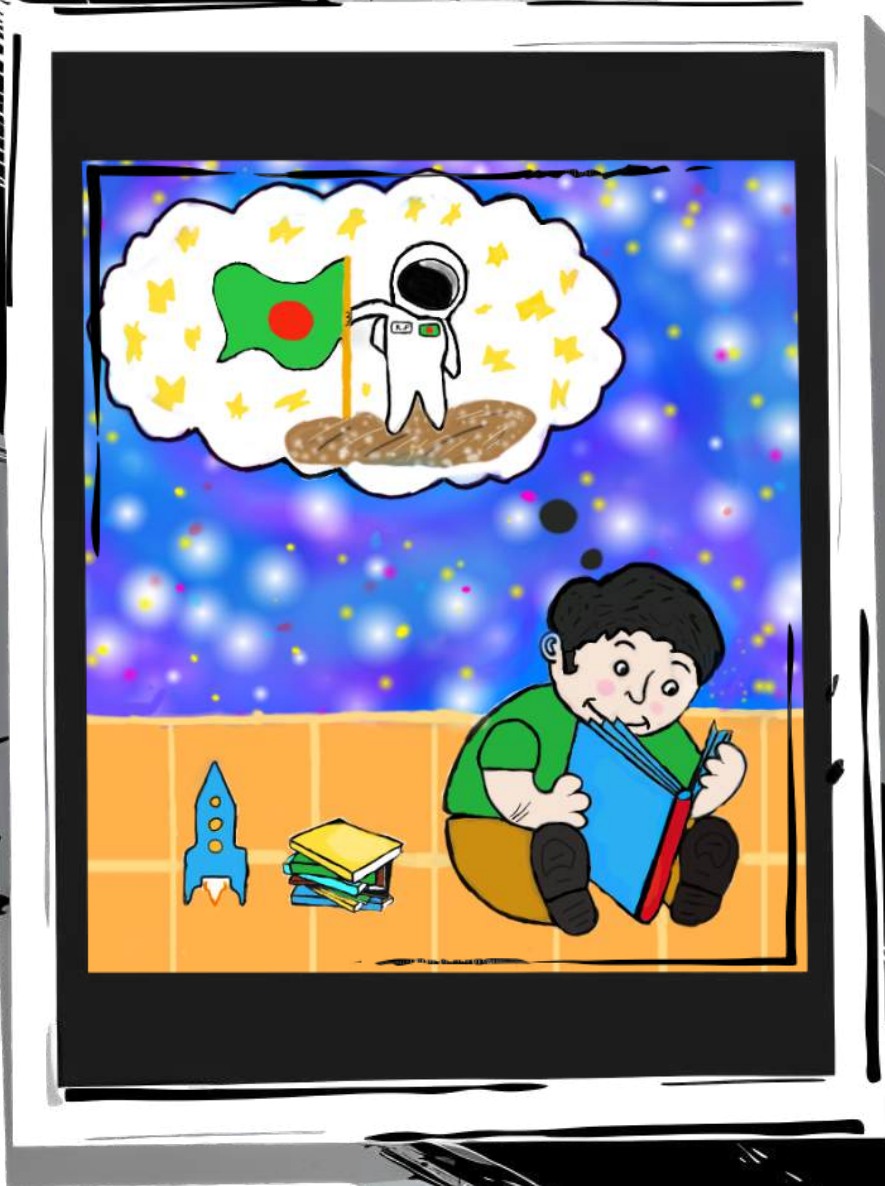
যে বলের প্রভাবে প্রোটন ও নিউট্রন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ থাকে, তাকে বলে সবল নিউক্লীয় বল।

দুর্বল নিউক্লীয় বল

যে বলের কারণে পরমাণুর নিউক্লিয়াস তেজস্ক্রিয় ধর্ম প্রদর্শন করে, সেই বলকে দুর্বল নিউক্লীয় বল বলা হয়।

তড়িৎ চৌম্বক বল

দুটি আহিত বা চার্জিত বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলকে তড়িৎ চৌম্বক বল বলে।



রোহান পালা

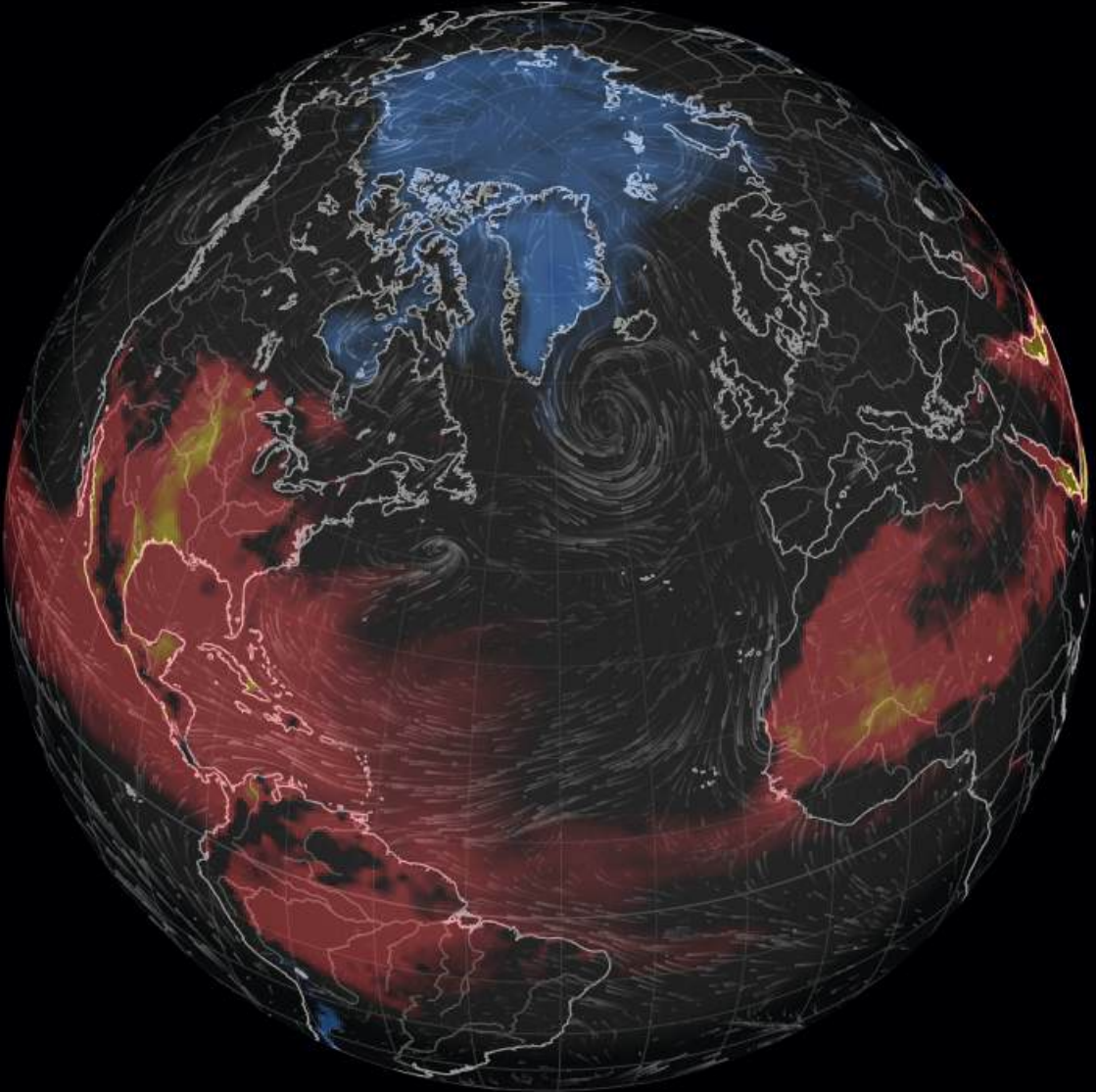
আমাদের সময়

নুসরাত জাহান তাবাসসুম

হুমিয়ে আসছে



কখনো কি এমন মনে হয়েছে যে আজকের দিনের সময়টা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল? গত অর্ধশতাব্দির তুলনায় পৃথিবী এখন দ্রুত ঘুরছে। যার ফলে দিনগুলো আগের চেয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে। যদিও এটি খুবই ছোট একটা পার্থক্য তবুও পদার্থবিদ, কম্পিউটার প্রোগ্রামার এবং স্টকব্রোকারদের কাছে এটি একটি বিরাট মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।



পৃথিবী ঘুরে কেনো?

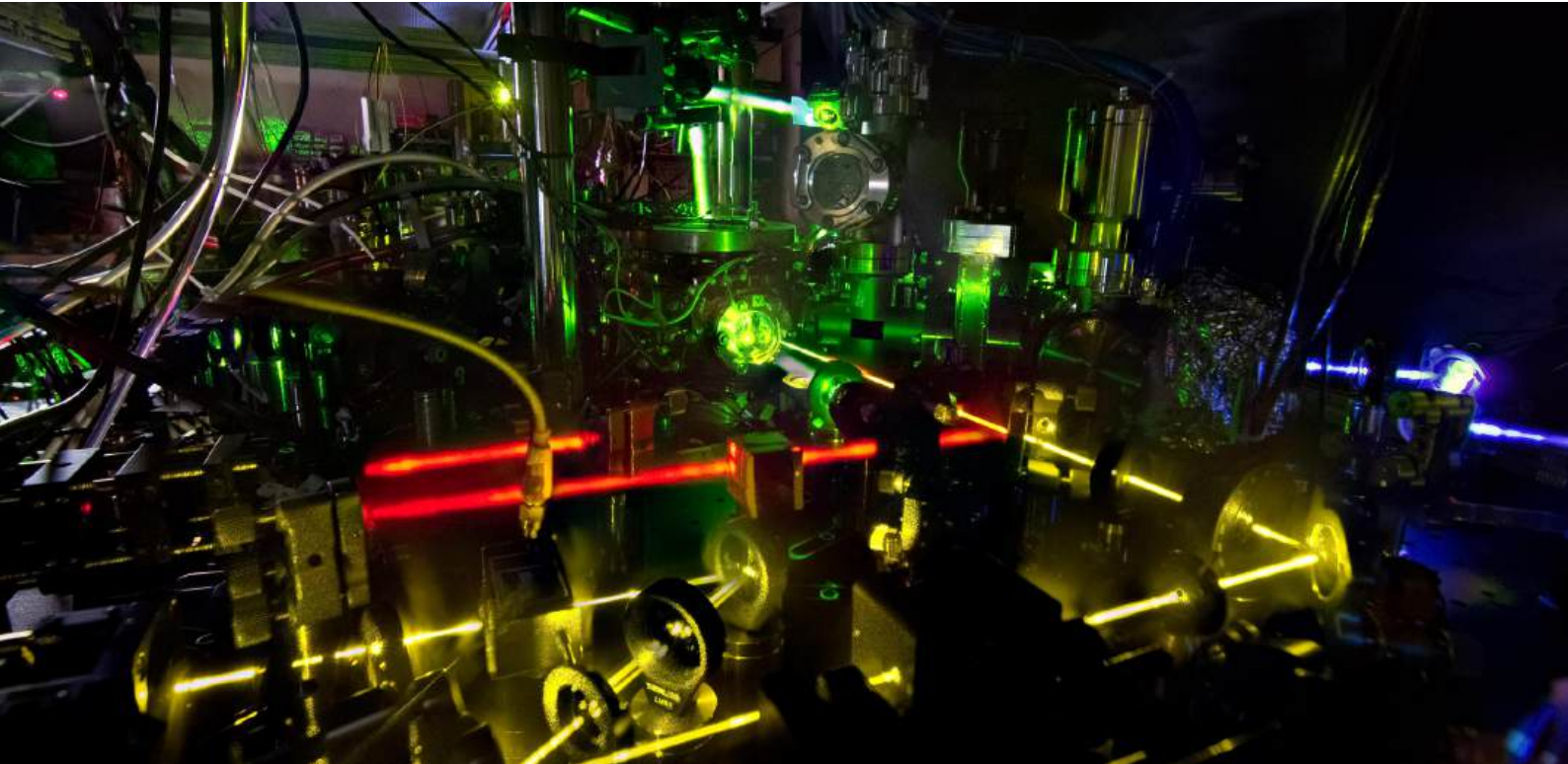
আমাদের সৌরজগৎ প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে গঠিত হয় যখন একটি আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূলিকণা এবং গ্যাসের ঘন মেঘ ভেঙ্গে ছিটকে পড়ে এবং ঘুরতে শুরু করে। আমাদের পৃথিবীর ঘূর্ণন এখনো সেই মূল গতিবিধির সাক্ষ্য বহন করছে। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির একজন উর্ধ্বতন গবেষণা বিজ্ঞানি পিটার হুইবারলি ব্যাখ্যা করেন, “একটি ঘূর্ণায়মান বস্তুর ধর্ম হলো এটি ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না এটিকে সক্রিয়ভাবে থামানোর চেষ্টা করা হয়।” সেই কৌণিক গতিবেগ এর জন্যই কোটি কোটি বছর ধরে আমরা দিন এবং রাত অনুভব করতে পারছি। কিন্তু এই ঘূর্ণনের হার সবসময় সমান থাকে না।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করার সময় পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর প্রায় ৪২০টি ঘূর্ণন সম্পন্ন করতো। প্রবালের খোলসের উপর অনিয়মিত বৃদ্ধিরেখা হিসাব করে আমরা সেই বাড়তি দিনগুলির প্রমাণ পাই। ১৮৯০ এর দশক থেকে বিজ্ঞানীরা প্রবালের খোলসের উপর এই ধরনের শিলা বা রেখা পর্যবেক্ষণ করছেন যা তাদের বার্ষিক বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও সময়ের সাথে সাথে দিনগুলি ধীরে ধীরে দীর্ঘ হচ্ছে, (আংশিকভাবে চাঁদের অভিকর্ষ বলের জন্য পৃথিবীর মহাসাগরগুলো যেভাবে আকর্ষিত হয় তা পৃথিবীর ঘূর্ণন কিছুটা ধীর করে দেয়) তবুও আমরা প্রায় ২৪ ঘণ্টায় এক ঘূর্ণন হিসাব করি যার অর্থ দাঁড়ায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময় পৃথিবী প্রায় ৩৬৫টি ঘূর্ণন সম্পন্ন করে। বিজ্ঞানীরা উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন পৃথিবীর ঘূর্ণন পর্যবেক্ষণ করছেন এবং বুঝতে পেরেছেন প্রতিটা পূর্ণ ঘূর্ণনে পৃথিবী যতটুকু সময় নেয় তার মধ্যে কিছুটা তারতম্য ঘটে।

সময় শনাক্ত করার নতুন উপায়

১৯৫০ এ বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক ঘড়ি তৈরী করেন। যা সিজিয়াম পরমানুর উত্তেজিত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার উপর ভিত্তি করে সময় দেয়। পরমাণু সময়ের সাথে তাদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে না অতএব, পারমাণবিক ঘড়ি একটি অত্যন্ত নির্ভুল এবং কার্যকরী সমাধান। এটি বাহ্যিক পরিবর্তন যেমন তাপমাত্রার পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

চিত্র। সিজিয়াম পরমাণুর কম্পনের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি করেছেন যা অত্যন্ত নিখুঁত মান দিতে পারে। © ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেকনোলজি



কিন্তু কয়েক বছর যাবত বিজ্ঞানিরা আরেকটি নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। স্থির পারমাণবিক ঘড়ির সময়ের সাথে বাকি বিশ্বের সময়ের সামান্য তারতম্য দেখা যাচ্ছিলো। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড

টেকনোলজির সময় ও তরঙ্গ বিভাগের একজন পদার্থবিদ Judah Levine বলেন, “সময়ের সাথে সাথে পারমাণবিক ঘড়ি দ্বারা পরিমাপকৃত সময় এবং জ্যোতির্বিদ্যা দ্বারা পরিমাপকৃত সময় অর্থাৎ পৃথিবী বা চাঁদ এবং তাঁরার অবস্থানের দ্বারা পরিমাপকৃত সময়ের মাঝে পার্থক্য দেখা দেয়।

সাধারণত পারমাণবিক ঘড়ি দ্বারা হিসাবকৃত এক বছর পৃথিবীর গতিবিধি থেকে গণনা করা এক বছরের তুলনায় কিছুটা দ্রুত ছিলো। Levin বলেন, “এই পার্থক্য খুব বেশি বড় হওয়ার আগে ১৯৭২ সালে পারমাণবিক ঘড়িতে পর্যায়ক্রমে লিপ সেকেন্ড যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।”

লিপ সেকেন্ডগুলি কিছুটা লিপ ইয়ারের মতো কাজ করে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫.২৫ দিন সময় লাগে এই তথ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা চার বছর পর পর ফেব্রুয়ারির শেষে একটি বাড়তি দিন যুক্ত করি। এটা প্রতি চার বছর পর পর নির্ধারিত, কিন্তু লিপ সেকেন্ড অনিদিষ্ট ও অপ্রত্যাশিত।

‘ইন্টারন্যাশনাল আর্থ রোটেশন এন্ড রেফারেন্স সার্ভিস সিস্টেম’ আরো অনেক পদ্ধতিসহ স্যাটেলাইট গুলোতে লেজার বিম পাঠানোর মাধ্যমে গ্রহগুলোর গতিবিধি পরিমাপ করে। গ্রহগুলো কত দ্রুত ঘুরছে তার উপর নজরদারি করে। পৃথিবীর সাপেক্ষে সময় পরিমাপ করার সময় যখন এস্ট্রোনমিকাল ওয়াচ এটোমিক ওয়াচের থেকে এক সেকেন্ডের কাছাকাছি সময় পিছিয়ে পড়ে তখন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানিরা ঠিক এক সেকেন্ড যাবত এটোমিক ওয়াচগুলো বন্ধ রাখার জন্য এটমিক ওয়াচগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। ৩০ জুন বা ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১:৫৯:৫৯ সেকেন্ডে এটা করা হয় যাতে এস্ট্রোনোমিকাল ঘড়ির সাথে এটমিক ঘড়ির সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন

১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম লিপ সেকেন্ড যুক্ত করা হয়। তারপর থেকে কয়েক বছর অন্তর অন্তর লিপ সেকেন্ড যুক্ত করা হচ্ছে। এগুলো অনিয়মিতভাবে যুক্ত করা হয়েছে কারণ পৃথিবীর ঘূর্ণন অনিয়মিত। কখনো গতি বাড়ে, কখনো কমে।

পৃথিবীর ঘূর্ণন হার একটি যটিল বিষয়। এটি পৃথিবী এবং বায়ুমন্ডলের মধ্যে কৌণিক ভরবেগের বিনিময়, চাঁদ ও সমুদ্রের প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত। এ সম্পর্কে levin বলেছেন, “ভবিষ্যতে কি হবে তা নিয়ে আপনি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারবেন না”।

বিগত এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে পারমাণবিক ঘড়ির সাপেক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণনের এই মনহরতা কমে গেছে। ২০১৬সাল থেকে একটিও লিপ সেকেন্ড যোগ করা হয়নি অর্থাৎ পৃথিবীর ঘূর্ণন দ্রুত হয়েছে যার ফলে এটি পারমাণবিক ঘড়ির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারছে। বর্তমানে আমাদের পৃথিবী বিগত অর্ধ শতাব্দীর তুলনায় দ্রুত ঘুরছে। বিজ্ঞানিরা নিশ্চিত নন কেনো এমনটা হচ্ছে। ধারণা করা হয়েছিলো লিপ সেকেন্ডের প্রয়োজন অব্যাহত থাকবে এবং লিপ সেকেন্ড যুক্ত হতে থাকবে। তার কারণ লিপ সেকেন্ডের প্রয়োজন হবে না এরকম পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি। তাই এই ফলাফল বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই আশ্চর্যজনক।

লিপ সেকেন্ড নিয়ে ঝামেলা

পৃথিবীর ঘূর্ণন কতটা দ্রুত হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীদের পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। এই মুহূর্তে চিন্তার বিষয় হলো যদি এভাবে পৃথিবীর ঘূর্ণন দ্রুত হতে থাকে তাহলে একটা সময় নেগেটিভ লিপ সেকেন্ড যুক্ত করার প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ পারমাণবিক ঘড়ি এক সেকেন্ড বন্ধ রাখার বদলে এক সেকেন্ড ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু নেগেটিভ লিপ সেকেন্ড বিজ্ঞানীদের অনেক গুলো চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন করবে। এর আগে কখনোই নেগেটিভ লিপ সেকেন্ড যুক্ত করা হয়নি এবং চিন্তার বিষয় হলো এমন কোনো সফটওয়্যার যা এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে তার কার্যকারীতা আগে থেকে পরিক্ষা করার সুযোগ নেই।

তাছাড়া রেগুলার লিপ সেকেন্ড হোক বা নেগেটিভ লিপ সেকেন্ড হোক না কেনো, এই ক্ষুদ্র পরিবর্তন গুলো টেলিযোগাযোগ থেকে নেভিগেশন সিস্টেম পর্যন্ত পরিসরের সকল শিল্পের জন্য একটা বিশাল মাথাব্যথার কারন হতে পারে। এর কারণ হলো লিপ সেকেন্ড সময়ের উপর এমনভাবে হস্তক্ষেপ করে যার সাথে কম্পিউটারগুলো মানিয়ে নিতে প্রস্তুত নয়। Levin বলেন, “ইন্টারনেটের প্রাথমিক মেরুদন্ড হলো সময় চলমান”। যদি তথ্যের এই চলমান প্রক্রিয়ায় ব্যঘাত ঘটে তাহলে তথ্যসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। একটা সেকেন্ডের পুনরাবৃত্তি করা বা একটা সেকেন্ড বাদ দেওয়া এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিতে ফাঁক সৃষ্টি করবে। আর্থিক শিল্পের জন্যও একটি বিরাট সমস্যার কারন হতে পারে যেখানে প্রতিটি লেনদেনের আছে নিজস্ব ইউনিক টাইমস্টেম্প।

কিছু কম্পানি লিপ সেকেন্ড সমস্যা সমাধানের জন্য নিজস্ব উপায় বের করেছে। যেমন: Google Smear. লিপ সেকেন্ডের দিনগুলিতে google ঘড়ি বন্ধ করার পরিবর্তে প্রতিটি সেকেন্ডকে অল্প দীর্ঘায়িত করে। কিন্তু এটি, সময়কে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে একমত পোষণ করে না।

[অ্যাস্ট্রোনমি ডট কম অবলম্বনে লেখা]



DARK MATTER

An Unknown Truth with Mysteries

Habibur Rahman

Most of us may have heard of the dark web, dark world or maybe anything related to dark; but how many of us have any idea about dark energy or dark matter? If you put just a little attention on all the other items mentioned here, there are just the biggest mysteries peeking around. They are all something more than their non-dark counterparts, and so is the case for dark energy.

The forms of energy that we are feeling or seeing in everyday life are all basic forms of energy, where dark energy is something much deeper than that. In general, dark energy could be indicated as the energy that is beyond our senses; the energy that we cannot see or feel. In bookish terms, dark energy is the name given to the mysterious force that's causing the rate of expansion of our universe to accelerate over time, rather than to slow down.

From the very beginning of science, humans have shown much interest in going beyond their limits. Throughout the development of science, we have been trying to understand our universe and possibly beyond. Like - how did all of this happen, how we came to be, how the universe formed etc. But everything has its limit and so does the human being. There are many things in nature that are still far beyond our knowledge. So far we're only aware of a little part of the universe; most of it is still unknown or unaccounted for and we named it dark matter & the associated energy DARK ENERGY.

Figure | Our universe is expanding and this expansion rate is accelerating. © Nico Roper/Quanta Magazine



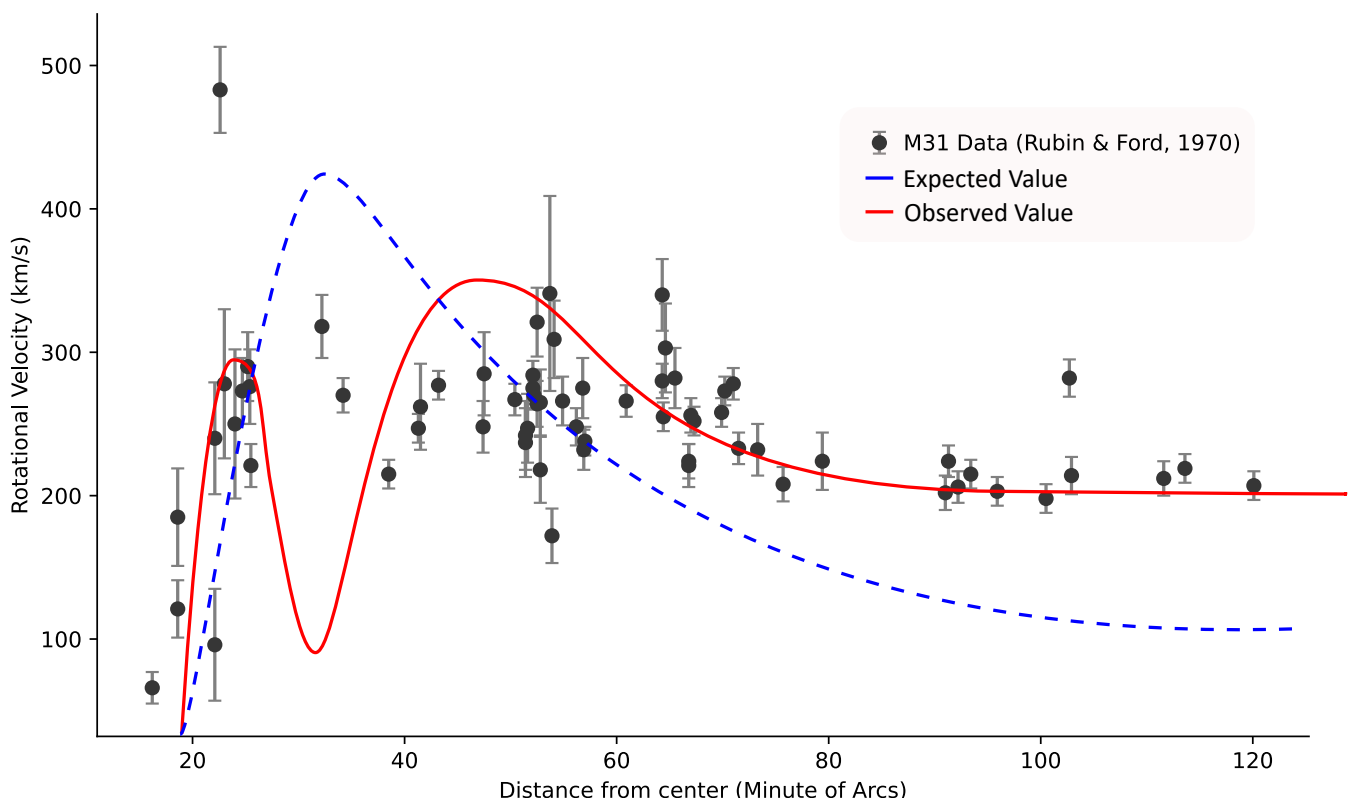
Hence, in short, it is still a mystery to us and we humans tend to have a bit of extra curiosity to know the unknown. So, we started exploring...

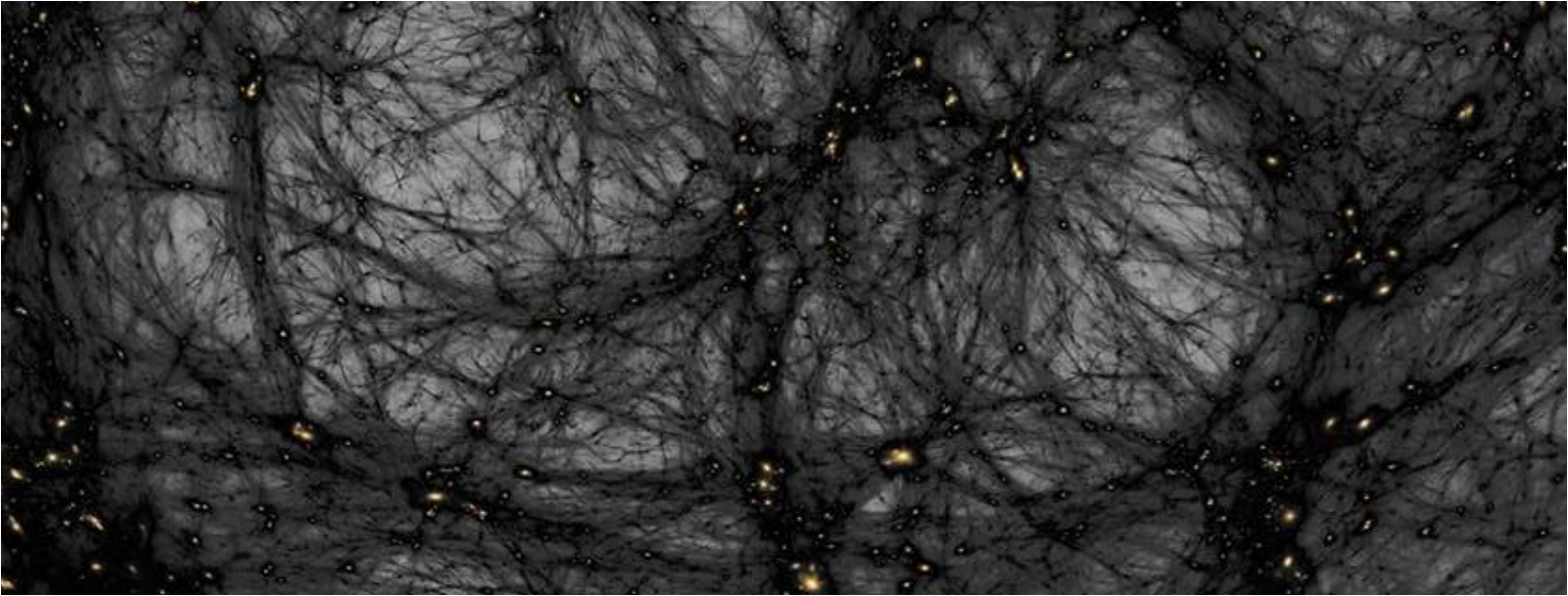
As we searched, we came to know that in our Milky Way galaxy there are billions of stars arranged in a spiral pattern radiating out from the center, with illuminated gas in between. But our eyes can see only a small portion of it. About 95% of it is still unknown that holds the mass of our galaxy and does not interact with light; it remains dark. Thus we named it Dark matter, which has never been observed and we actually used to believe that it could never really be done; simply beyond our limit.

Dark matter as a hidden mass in galaxies was first proposed in the 1930s by Fritz Zwicky. But the idea remained controversial until the 1960s and 1970s, when Vera C. Rubin and colleagues confirmed that the motions of stars around their galactic centers would not follow the laws of physics if only normal matter were involved. But now a recent study shows how dark matter affects our solar system. We used to know that the vital mass of our Milky way galaxy is dominated by dark matter. The new study is estimated near the sun and shows two different analytical models yielding consistent results. One is a two-step Hernquist model, the other one is the Navarro–Frenk–White model.¹

Figure | The outer part of the M31 galaxy was seen to rotate faster than the expected values calculated using laws of physics. This indiscrepancy give rise to the discovery of dark matter. Data from Rubin and Ford, 1970

¹You can find the detail study here, <https://doi.org/10.1093/mnras/stab3781>





Advisor to NASA's Office of the Chief Scientist and co-author of this study Jim Green said,

”

We're predicting that if you get out far enough in the solar system, you actually have the opportunity to start measuring the dark matter force. This is the first idea of how to do it and where we would do it.

Let us have a detailed discussion on this- Firstly, we have to know about the dark matter around us. Gravity helps us to stick to the surface of earth; we're not flying out from the surface. And the earth remains in its orbit because of its gravity towards the sun. But when a spacecraft flies far from the sun, it constantly starts losing gravity towards the sun, but it feels another source of gravity. And that's the most part of the universe, which is mostly dark matter. Today, the nature of dark matter is one of the biggest mysteries in all of astrophysics. Powerful observatories like the Hubble Space Telescope and the Chandra X-Ray Observatory have helped scientists begin to understand the influence and distribution of dark matter in the universe at large.

To understand the influence of dark matter, lead study author Edward Belbruno calculated the "galactic force," the overall gravitational force of normal matter combined with dark matter. He found that in the solar system, about 45 percent of this force is from dark matter and 55 percent is from normal, so-called "baryonic matter".

Edward Belbruno who is a mathematician and astrophysicist at Princeton University and Yeshiva University commented, "I was a bit surprised by the relatively small contribution of the galactic force due to dark matter felt in our solar system as compared to the force due to the normal matter."

Which means dark matter is in the outer part of our galaxy and far from our solar system.

Now you may ask, how dark matter may influence a spacecraft? Well, here Belbruno said, "If spacecrafts move through the dark matter for long enough, their trajectories change, and this is important to take into consideration for mission planning for certain future missions."

According to the new study, both the scientists predict that dark matter's gravity ever so slightly interacts with all of the spacecraft that NASA has sent on paths that lead out of the solar system. If a spacecraft travels billions of miles, then it would deviate by some feet (5-6 feet) by the influence of dark matter. As they are so small, we can't really measure it.

Well, now a new question arrives, At exactly where we would find galactic force? So basically, we feel gravitational force around the earth and sun. The farther we go from the sun, the more gravitational force we lose. And the galactic force becomes stronger. Belbruno and Green calculated that this transition happens at around 30,000 astronomical units, or 30,000 times the distance from the Earth to the Sun. That is well beyond the distance of Pluto, but still inside the Oort Cloud, a swarm of millions of comets that surrounds the solar system and extends out to 100,000 astronomical units.

So here comes the most interesting part, Could dark matter's gravity be measured? We don't need a spacecraft to travel that far for measurements. It's simply illogical for now. But both the scientists said, "At a distance of 100 astronomical units, a spacecraft with the right experiment could help astronomers measure the influence of dark matter directly."

Figure | NASA's Voyager 1 spacecraft can be used to measure the influence of dark matter © NASA/JPL-Caltech










































Hypothetically, a spacecraft equipped with radio isotope power, a technology that has allowed Pioneer 10 and 11, the Voyagers, and New Horizon to fly very far from the Sun, may be able to make this measurement. Such a spacecraft could carry a reflective ball and drop it at an appropriate distance. Then the ball would feel only galactic forces, while the spacecraft would experience a thermal force from the decaying radioactive element in its power system, in addition to the galactic forces. Subtracting out the thermal force, researchers could then look at how the galactic force relates to deviations in the respective trajectories of the ball and the spacecraft. Those deviations would be measured with a laser as the two objects fly parallel to one another.

It becomes more interesting after knowing that a mission concept was proposed called Interstellar Probe, which aims to travel about 500 astronomical units away from the Sun to explore that uncharted environment and can potentially complete this type of experiment. Though it is still beyond our reach, we believe, one day we are going to make it. There is hope, because astronomers will learn more about dark matter in the cosmos with the newest set of state-of-the-art telescopes.

NASA's James Webb Space Telescope, which launched Dec. 25, 2021, will contribute to our understanding of dark matter by taking images and other data of galaxies and observing their lensing effects.

Also, The European Space Agency's forthcoming Euclid mission, which has a NASA contribution, will also target dark matter and dark energy, looking back in time about 10 billion years to a period when dark energy began hastening the universe's expansion.

So, yeah, we can have at least a little 'faith' in science. There is much more to see, much more to learn.

		 SUN		 MARS	 EARTH			
 VENUS	 EARTH							 SUN
 MERCURY				 SUN	 NEPTUNE		 SATURN	
 EARTH		 SATURN	 NEPTUNE	 VENUS	 SUN	 MARS	 JUPITER	
 NEPTUNE	 SUN			 SATURN		 VENUS	 EARTH	
			 MERCURY		 MARS			 SATURN
 SUN	 VENUS	 MERCURY		 NEPTUNE	 SATURN			 MARS
	 JUPITER	 EARTH	 MARS				 SUN	
		 URANUS	 SUN		 JUPITER			 EARTH

the Solar Sudoku

1. Each space in the 9 x 9 grid should contain one of the 8 planets or the Sun.

2. Each row, column, and 3 x 3 quadrant should contain the planets and the Sun without repetition.

3. Send your solution to our email
camsust@gmail.com



মোহাম্মদ মুক্তাদির রহমান

অরোরা

যত রহস্য

I was searching for the northern lights in the ice-cold spheres of your empty eyes

রহস্যময় অরোরাকে (মেরুপ্রভা/মেরুজ্যোতি) নিয়ে কবি সাহিত্যিকরাও তাদের কবিতা কিংবা উপন্যাসে নর-নারীর রোমান্স রূপায়ন করতে ভুলেননি। অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল দুনিয়াজুড়ে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম একটি, অরোরা নিয়ে লিখার। চলুন আজ সংক্ষেপে জেনে নেয়া যাক রহস্যময় অরোরা সৃষ্টির গল্পটি!

অরোরা শব্দটি এসেছে রোমান ঊষাদেবী অরোরা'র নাম থেকে। প্রাচীন গ্রিক কবিগণ রূপক অর্থে শব্দটি ব্যবহার করতেন ভোরকে বুঝাতে। তারা বলতেন এ যেন অন্ধকার আকাশ জুড়ে রঙের খেলা! অরোরা নিয়ে প্রাচীনকালে অনেক উপকথাও চালু ছিল। যেমন নর্জ উপকথা অনুসারে অরোরা হলো ঈশ্বরের সৃষ্টি সেতু। আবার কিছু কুসংস্কারচ্ছন্ন মানুষ মনে করেন তাদের পূর্বপুরুষেরা আকাশে নাচানাচি করে তাই আকাশের রঙ বদলেয়া যায়! অনিন্দ্য সুন্দর এই অরোরা দেখে কখনো আপনার মনে হবে যেনো আকাশের বুকে বর্ণীল আলোর নৃত্য হচ্ছে; আবার কখনো মনে হবে যেনো আকাশের বুকে রঙ্গিন আলোর ঢেউ উঠেছে! দেখতে অত্যন্ত সুন্দর এই অরোরা হলো আকাশে একধরনের প্রাকৃতিক আলোর প্রদর্শনী।

চলুন জেনে নেয়া যাক বিজ্ঞান এই সম্পর্কে কী বলে।

সূর্য আমাদের থেকে প্রায় ৯৩ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু এর প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সৌরঝড়ে চার্জিত কণা (প্লাজমা) পৃথিবীর মেরুতে ছড়িয়ে পড়ায় এ অরোরার সৃষ্টি হয়। সৌরঝড় কি? চলুন সংক্ষেপে জেনে নিই!

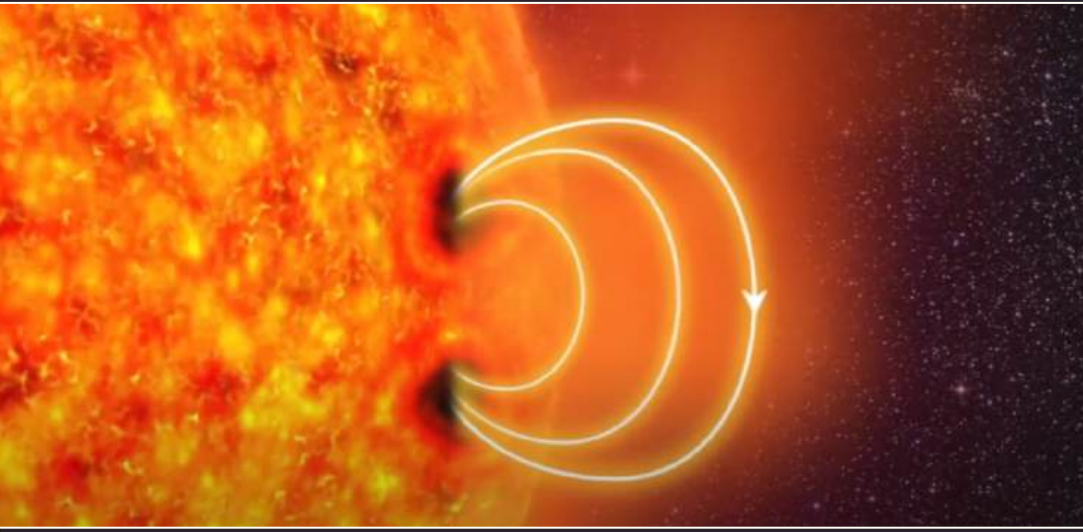
সূর্য একটি বৃহদাকার পাওয়ার প্লান্ট! সূর্যের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা প্রায় ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস! প্রচণ্ড চাপ ও তাপে এর অভ্যন্তরের হাইড্রোজেন পরমাণু অনবরত হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে; সাথে নির্গত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ শক্তি। অত্যধিক উচ্চ তাপমাত্রায় এসব গ্যাস আয়নিত (ইলেকট্রিক্যালি চার্জড) অবস্থায় থাকে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় সোলার ডায়নামো। সোলার ডায়নামো সৃষ্ট প্লাজমা (আয়নিত গ্যাস) সূর্যের একটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে। সূর্যের চলমান সক্রিয়তার [ফ্লেয়ার(Flares), প্রমিনেন্স (Prominence), সানস্পট (Sunspots), করোনাল মাস ইজেকশন (Coronal Mass Ejections)] কারণে এই প্লাজমা সূর্য থেকে নির্গত হয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনাকেই আমরা সৌরঝড় বলে থাকি। কয়েক বিলিয়ন টন প্লাজমা এভাবে মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয় এবং ঘণ্টায় প্রায় ৮ মিলিয়ন কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগ নিয়ে সূর্যের প্রচণ্ড গ্রাভিটেশনাল পুলকে অতিক্রম করে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসতে থাকে!

সৌরঝড় বুধ ও শুক্র গ্রহকে অতিক্রম করে একসময় পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। তখন এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। পৃথিবীর অদৃশ্য এক আবরণ, এর ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৌরঝড়ে আসা ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে ডিফলেক্ট করে এর যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেয় এবং দুই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে ইন্টার্যাকশনের ফলস্বরূপ একটি ফানেলাকৃতির পথ হয়ে প্লাজমা পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের আলোকিত অংশে (দিন) পৌঁছায় এবং এর ফলে সৃষ্টি হয় 'ডে লাইট অরোরা'। কিন্তু এটি ডিম (মৃদু) হওয়ায় দিনের বেলা সূর্যের আলোর তীব্রতার কারণে ডে লাইট অরোরা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। ম্যাগনেটিক ফিল্ডদ্বয় আরো সামনে এগিয়ে মেরুদ্বয়ের অন্ধকার অংশে (রাত) যেতে থাকে। একসময় রাবার ব্যান্ডের মত ভেঙ্গে যায় এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন বরাবর প্লাজমা অন্ধকার দুই মেরুতে গিয়ে পৌঁছায়। এর ফলে দৃশ্যমান হয় 'নাইট টাইম' (রাতের) অরোরা।



এই বর্ণীল আলোকচ্ছটা অ্যাক্টিব মেকানিজমটাই বা কি!

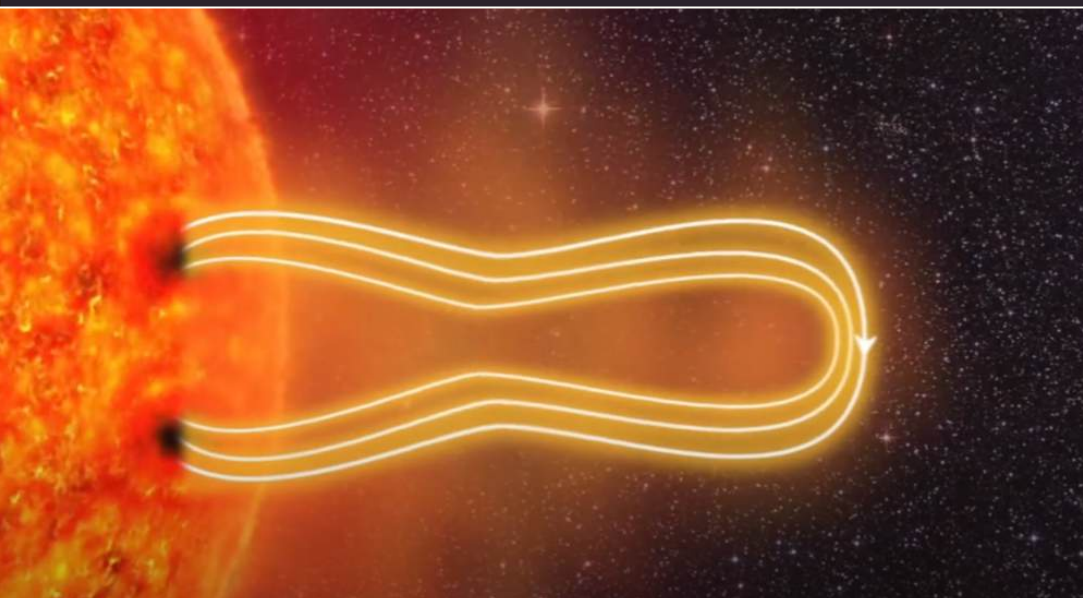
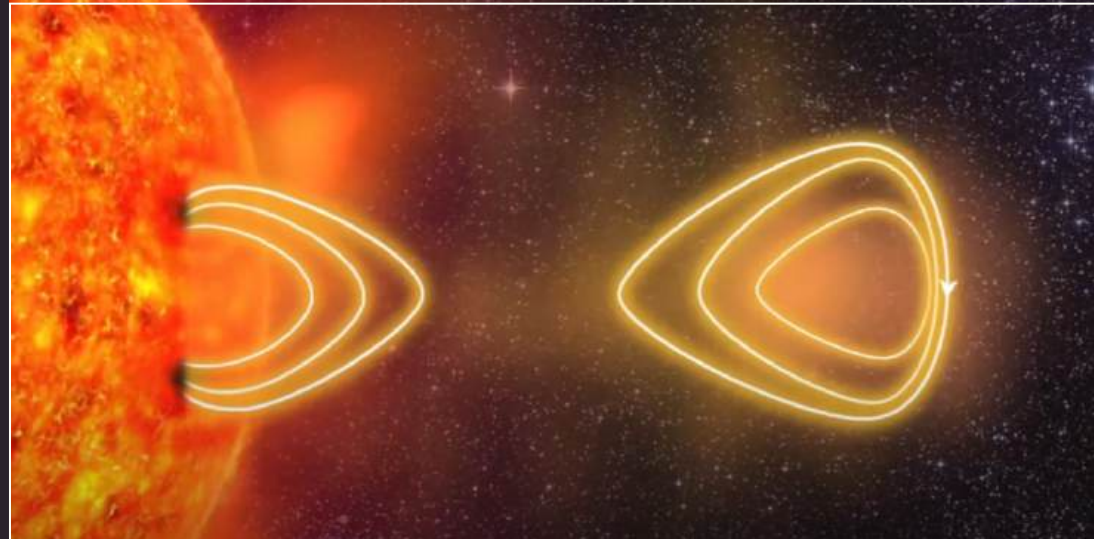
প্লাজমায় থাকে ইলেকট্রিক্যালি চার্জড পার্টিকেল প্রোটন এবং ইলেক্ট্রন। পৃথিবীতে এসব কণা পৌঁছালে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এবং বায়ুমন্ডল এর সাথে মিথস্ক্রিয়া হয়। যখন সূর্যের চার্জিত কণাগুলো আমাদের পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের অণু-পরমাণুকে আঘাত করে তখন সেই চার্জিত কণাগুলো বায়ুমন্ডলের অণু-পরমাণুগুলোকে আন্দোলিত করে এবং উজ্জ্বল করে তোলে। পরমাণু আন্দোলিত হওয়ার অর্থ হল এই যে, যেহেতু পরমাণু নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসকে আবর্তনরত ইলেক্ট্রন দ্বারা গঠিত, তাই যখন সূর্য থেকে আগত চার্জিত কণা বায়ুমন্ডলের পরমাণুকে আঘাত করে তখন ইলেক্ট্রনগুলো উচ্চ শক্তিস্তরে (নিউক্লিয়াস থেকে আপেক্ষিকভাবে দূরে) ঘুরতে শুরু করে। তারপর যখন আবার কোনো ইলেক্ট্রন নিম্ন শক্তিস্তরে চলে আসে তখন সে পরমাণু শক্তি নিঃসরণ করে। যা ফোটন বা আলো হিসেবে নিসৃত হয়।



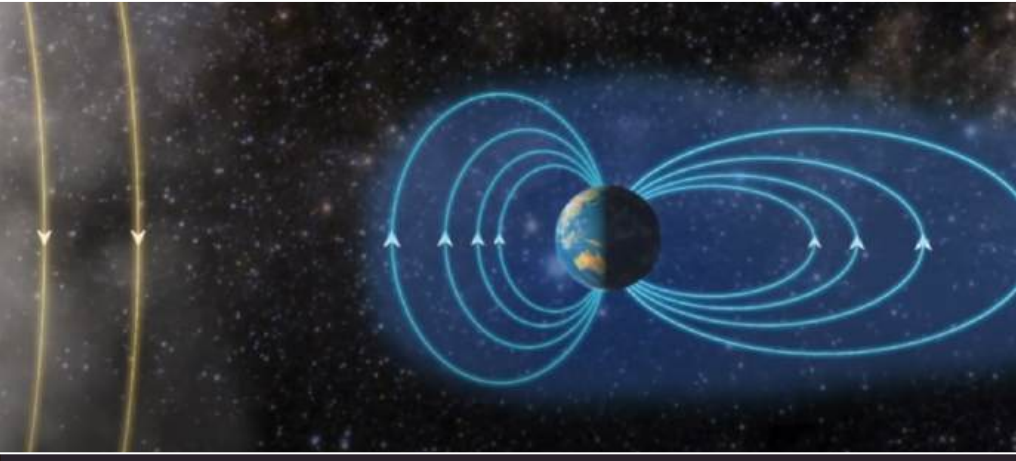
সক্রিয় অংশে
সূর্যের
ম্যাগনেটিক
ফিল্ড



রাবার ব্যান্ডের মত প্রসারিত
হয়ে টুইস্ট হচ্ছে প্লাজমা
দ্বারা সৃষ্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড
রাবার ব্যান্ডের মত প্রসারিত
হয়ে টুইস্ট হচ্ছে প্লাজমা
দ্বারা সৃষ্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড



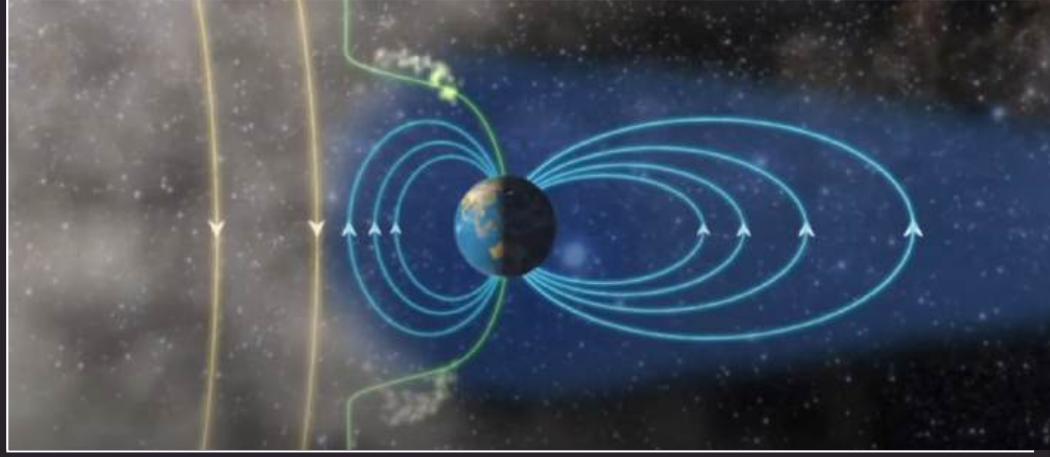
ভেঙে আলাদা
হয়ে যাচ্ছে
প্লাজমায় সৃষ্ট
ম্যাগনেটিক
ফিল্ড



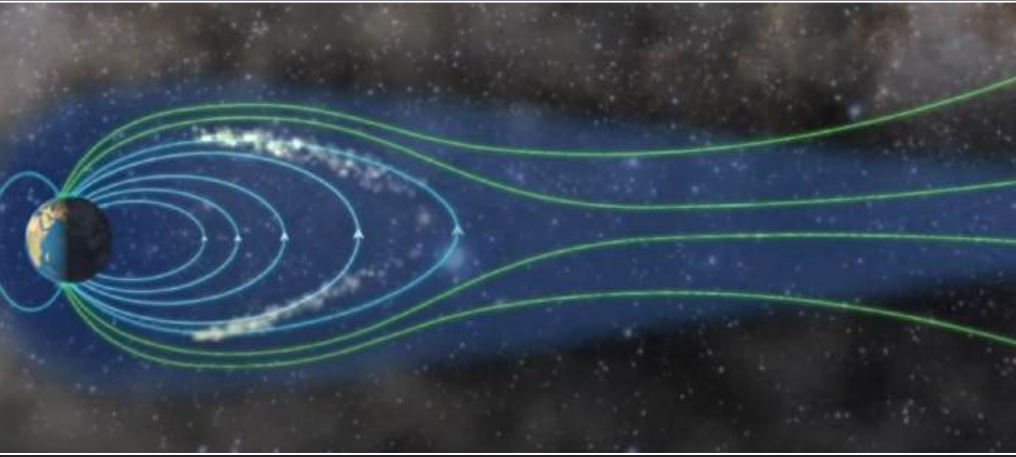
পৃথিবীর ম্যাগনেটিক
ফিল্ড ও সূর্যের
ম্যাগনেটিক ফিল্ডের
মধ্যে মিথস্ক্রিয়া



ডিফ্লেক্টেড হয়ে প্লাজমার
ফানেলাকৃতির গতিপথ নিয়ে দুই
মেরুতে পৌঁছানো এবং সৌর ঝড়ের
ম্যাগনেটিক ফিল্ডের আরো
সামনের দিকে প্রসারিত হওয়া



পুনরায় দুই ম্যাগনেটিক
ফিল্ডের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া
ও রাবার ব্যান্ডের মত পুনরায়
ভেঙে আলাদা হওয়া



প্লাজমার মেরু
অঞ্চলে গিয়ে
পৌঁছানো ও
অরোরার সৃষ্টি



অরোরাতে যা ঘটে তেমনটি ঘটে নিয়নের বাতিতেও। নিয়ন টিউবের মধ্যে নিয়ন গ্যাসের পরমাণুগুলোকে আন্দোলিত করার জন্য ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ। তাই নিয়নের বাতিগুলো এরকম উচ্চ মানের রঙ্গিন আলো দেয়। অরোরাও ঠিক এভাবে কাজ করে। তবে এটি আরো বড় মাত্রায় হয়। অরোরা কখনো বৃত্তাকার অথবা বাঁকানো আলোর পর্দার মতো, কখনো ছড়িয়ে পড়া আলোর মতো, কখনো আবার পাখার আকৃতির আলোক বিচ্ছুরণের মতো হয়। বেশিরভাগ অরোরাতে সবুজ রঙ এবং গোলাপী রঙ দেখা যায়। তবে অনেকসময় লাল রঙ বা বেগুনী রঙের অরোরাও হতে পারে।

অরোরা দুই রকমের হয়: এক. Northern Lights (অরোরা বোরিয়ালিস): এটা উত্তর গোলার্ধ থেকে দেখা যায়। নরওয়ে, সুইডেন, আইসল্যান্ড, কানাডা, গ্রীনল্যান্ড, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো বেশকিছু অঞ্চলে দেখা যায়। দুই. Southern Lights (অরোরা অস্ট্রালিস): এটা দেখা যায় দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে। এন্টার্কটিকা, চিলি, আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় অরোরা অস্ট্রালিস দেখা যায়।

অরোরাতে সৃষ্ট রঙগুলো রহস্যময়। বিভিন্ন মিথোলজিতে অনেক কুসংস্কার উল্লেখ করা হয়েছে এ নিয়ে। তবে বিজ্ঞানীরা বলেন বিকিরিত রশ্মির রঙ নির্ভর করে ইলেকট্রনগুলো কত উচ্চতায় কোন পরমাণুর সাথে সংঘর্ষ করে তার উপর।

ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬০ মাইল পর্যন্ত উচ্চতায় নাইট্রোজেনের সাথে সংঘর্ষে বেগুনী রঙের ফোটন নির্গত হয়। ৬০-৯০ মাইল উচ্চতার মধ্যে নাইট্রোজেনের সাথে সংঘর্ষে নীল রঙের ফোটন বিকিরিত হয়। ৯০-১৫০ মাইল পর্যন্ত উচ্চতায় অক্সিজেনের সাথে ইলেকট্রনের সংঘর্ষে বিকিরিত আলোর রঙ হয় সবুজ। ১৫০ মাইলের উপরে অক্সিজেনের সাথে সংঘর্ষে লাল রঙের আলো নির্গত হয়। মেরুপ্রভা যখন দেখা যায় তখন এর সাথে মৃদু কম্পাঙ্কের শব্দ উৎপন্ন হয়। শীতের রাতে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৩০ ফুট উপরে হিসহিস (Crackling) শব্দ হয়!

চিত্র | নরওয়ে থেকে
দেখতে পাওয়া অরোরা
© অ্যালেক্স ওয়াইডস

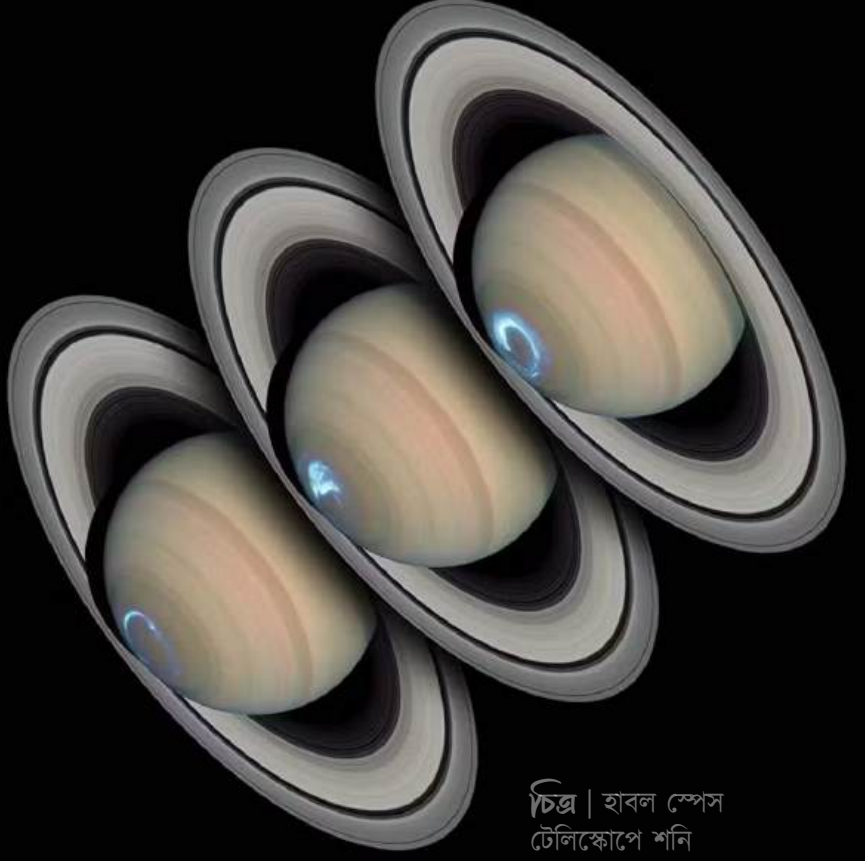


অরোরা সৃষ্টির জন্য বায়ুমণ্ডল এবং উচ্চশক্তিসম্পন্ন চার্জিত কণা প্রধান শর্ত। তাই বায়ুমণ্ডল বিশিষ্ট যে কোন গ্রহে যদি দ্রুতগতির চার্জিত কণা প্রবেশ করে তবেই অরোরা সৃষ্টি হবে। সৌরবায়ু যেহেতু সকল গ্রহেই পৌঁছে এবং সৌর জগতের প্রত্যেকটি গ্রহেরই বায়ুমণ্ডল আছে তাই সব গ্রহেই অরোরা বা মেরুপ্রভা সৃষ্টি হয়। তবে গ্রহভেদে এদের রূপ হয় ভিন্ন। শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র বিশিষ্ট শনি ও বৃহস্পতি গ্রহে পৃথিবীর ন্যায় মেরু অঞ্চলে অরোরা উৎপন্ন হয়। শুক্রের মত গ্রহের ক্ষেত্রে যেখানে উল্লেখযোগ্য চৌম্বকক্ষেত্র নেই, সেখানে অনিয়মিত প্রভা উৎপন্ন হয়। যে সকল গ্রহের চৌম্বক অক্ষ এবং ঘূর্ণন অক্ষ এক নয় যেমন ইউরেনাস ও নেপচুন, সেখানে বিকৃত (Distorted) প্রভা সৃষ্টি হয়। এছাড়াও কিছু প্রাকৃতিক উপগ্রহ, বাদামী বামন (Brown Dwarf) এবং এমনকি ধূমকেতুতেও অরোরা সৃষ্টি হয়!

শেষ করা যাক অরোরা নিয়ে হোমারের মহাকাব্য ওডেসিস'র বিখ্যাত একটি লাইন দিয়ে-

When Aurora, daughter of the dawn,
With rosy lustre purpled o'er the lawn

চিত্র | নেপচুন গ্রহে
নীলাভ অরোরা ©
জেমস ক্লার্ক, নাসা



চিত্র | হাবল স্পেস
টেলিস্কোপে শনি
গ্রহে অরোরা ©
নাসা/ইসা/হাবল

